শেষের পরে

অভীক দত্ত

শেষের পরে

১

মিঠুন চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, "এসব কী হচ্ছে বলো তো? তুমি যে লেভেলে সাজছ, আমার তো মনে হয় গ্রামে যেতে যেতে ভোর হয়ে যাবে।"

চন্দ্রিমা বলল, "এগুলোকে সাজা বলে না জান। একটু লিপস্টিক আর একটু কাজলকে মেক আপ বলে না।"

মিঠুন অবাক চোখে চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে বলল, "লিপস্টিক আর কাজল পরতেই তো দু ঘণ্টা হয়ে গেল।"

চন্দ্রিমা বলল, "মোটেও দু ঘণ্টা হয়নি। তোমার সব কিছু বাড়াবাড়ি। আর এত তাড়া দিলে কী করে হবে?"

মিঠুন বলল, "হ্যাঁ, কলকাতা থেকে চার ঘণ্টা ড্রাইভ করতে হবে আমায়, তাও সে কোনও গ্রামের ভিতরে। রাস্তা হারালে কোনও দিকে গিয়ে পড়ব কে জানে!"

চন্দ্রিমা বলল, "দ্যাখো মিঠুন আমার মামাবাড়ির রাস্তা আমার থেকে ভালো কেউ জানে না। তুমি চিন্তা কোরো না তো!"

মিঠুন হাল ছেড়ে দিল। চন্দ্রিমা বলল, "তুমি আজকের দিনটা থাকবে তো?"

মিঠুন বলল, "দেখি, যদি বিকেলের মধ্যে বেরোতে পারি তবে ফিরে আসব।"

চন্দ্রিমা বলল, "অ্যাজ ইউ উইশ। পুজো আর্চা থেকে দূরে থাকতে চাও, তাই তো?"

মিঠুন একটু শক্ত হল, "তুমি তো বোঝোই। আমি থাকলে যদি কোনওও প্রবলেম হয়।"

চন্দ্রিমা বলল, "আমি কিন্তু যেতে চাইনি। তুমিই জোর করলে।"

মিঠুন বলল, "কেন যাবে না, প্রতি বছর যাও।"

চন্দ্রিমা বলল, "আচ্ছা শোনো, আমি যখন থাকব না, পাশের ফ্ল্যাটের বউদি আবার খোঁজ-টোজ নিতে এলে বেশি ভালোবেসে ফেলো না যেন। ওর হাজব্যান্ড পারে না মনে হয়। বউদিটা সারাক্ষণ কেমন খাই খাই মুখ করে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে মনে হয় পেলেই খেয়ে নেবে একবারে।"

মিঠুন হাসতে হাসতে বলল, "খেলে খাবে। আমি তো সবসময় আছিই। বউদি ইজ সেক্সি। দিতে চাইলে ছেড়ে দেব?"

চন্দ্রিমা পাউডারের কৌটোটা মিঠুনের দিকে ছুড়ে মারল, "একবারে পিস পিস করে কেটে রেখে দেব বুঝলে? দাঁড়াও না, আমি রুমে রুমে সিসি টিভি বসাব এবার। আমি না থাকলে কী করো সব রেকর্ড হয়ে থাকবে।"

মিঠুন বলল, "বসিয়ো। আমি গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি এসো।"

২

যশোর রোড থেকে গাড়িটা যখন গ্রামের পথে ঢুকল তখন দুপুর দেড়টা বাজে। মিঠুন বলল, "আর কতক্ষণ বলো তো? উফ, এবার টায়ার্ড লাগছে কিন্তু।"

চন্দ্রিমা বলল, "ম্যাক্স আধ ঘণ্টা। এই তো বড়োমামা ফোন করছে। দাঁড়াও।"

চন্দ্রিমা ফোনটা ধরল, "হ্যাঁ মামা... হ্যাঁ আমরা এসে গেছি... আচ্ছা আচ্ছা... ঠিক আছে।"

ফোন রেখে চন্দ্রিমা বলল, “খানিকটা গিয়ে দেখবে একটা পুকুর পড়বে। ওখানে একটু দাঁড়িয়ো। মামা দাঁড়িয়ে আছে।”

মিঠুন অবাক হয়ে বলল, “পুকুরের ওখানে কী করছে?”

চন্দ্রিমা বলল, “কে জানে কী করছে। বুড়োর তো কাজ নেই কোনও। খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায়।”

মিঠুন বলল, “তোমার মামা আমার গাড়িতে উঠবেন?”

চন্দ্রিমা বলল, “কেন উঠবে না?”

মিঠুন বলল, “আমাকে পছন্দ না তো!”

চন্দ্রিমা বিরক্ত হল, “তুমি এখনও সব পুরোনো কথা ধরে আছ কেন বলো তো? মামার যদি অতই রাগ থাকত তাহলে কি তোমাকে গ্রামে নেমন্তন্ন করত?”

মিঠুন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “ভালো হলেই ভালো। এই নাও তোমার পুকুর এসে গেছে।”

চন্দ্রিমা বলল, “দাঁড়াও দাঁড়াও।”

মিঠুন গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বলল, “কী হল? কেউ নেই তো?”

চন্দ্রিমা বলল, “দাঁড়াও। মামাকে ফোন করি।”

চন্দ্রিমা ফোন করল, “হ্যালো... আচ্ছা আচ্ছা।”

ফোন রেখে বলল, “পাঁচ মিনিট।”

মিঠুন কাঁধ নাচাল, “ওকে।”

চন্দ্রিমা বলল, “নামি চলো গাড়ি থেকে। হাত পা ধরে গেল পুরো।”

মিঠুন বলল, “চল।”

দুজনে নামল। চারদিকে ধু-ধু মাঠ। চন্দ্রিমা চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিল। বলল, “উফ... তিন বছর পর। কী ফ্রেশ, তাই না?”

মিঠুন বলল, “হ্যাঁ। শুধু মানুষগুলো এই প্রকৃতির মতো একটু ফ্রি থিংকার হলে ভালো লাগত।”

চন্দ্রিমা বলল, “সবার একটু সময় লাগে মিঠুন। মানুষকে সময় দিতে হয়। দেখলে তো, সব ভুলে পুজোয় আসতে তো বলেছে আমাদের।”

মিঠুন চন্দ্রিমাকে কাছে টানল। দীর্ঘক্ষণ ধরে চন্দ্রিমার ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে চুমু খেল। চন্দ্রিমা ছাড়িয়ে নিল, “কী করছ? মামা কাছেই আছে।”

মিঠুন চারদিকে দেখে বলল, “কোথাও নেই।”

চন্দ্রিমা এবার আর বাধা দিল না, বলল, “মিস্টার মিঠুন, এত গরম হয়ে শহরে ফিরবে, দ্যাখো আমার সতিন না এসে যায়।”

মিঠুন চন্দ্রিমার কোমর ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, “ইচ্ছা তো করছে তোমায় নিয়েই শহরে যাই। তিন দিন আমি বেঁচে থাকব কী করে জান?”

মামা এসে গেছিলেন। চন্দ্রিমা তাড়াতাড়ি মিঠুনকে ছাড়িয়ে নিল।

চন্দ্রিমা মিঠুনের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে মামার দিকে দৌড়ে গেল। মামা তাদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন সম্ভবত। গম্ভীর হয়ে ছিলেন। চন্দ্রিমা তড়িঘড়ি বড়োমামাকে প্রণাম করল। বড়োমামা বললেন, “জামাই কি আজ ফিরে যাবে?”

চন্দ্রিমা বলল, “হ্যাঁ মামা, ওর আবার অফিস আছে কাল।”

মিঠুন প্রণাম করল এগিয়ে এসে।

বড়োমামা বললেন, “থাক থাক। চলো। রওনা হওয়া যাক।”

চন্দ্রিমা পিছনের সিটে বসল। বড়োমামা মিঠুনের পাশে বসলেন।

মিঠুন গাড়ি স্টার্ট দিল।

বড়োমামা বললেন, “মাঝে মাঝে এসে থাকতে পারো তো।”

মিঠুন বলল, “বুঝতেই পারছেন, অফিসের যা ঝামেলা চলে।”

চন্দ্রিমা বুঝল বড়োমামার সঙ্গে মিঠুন সহজ হতে পারছে না। সে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, “মামা এবার রিংকুদিরা আসবে?”

বড়োমামা বললেন, “হ্যাঁ। সবাই আসবে।”

রাস্তা সরু হলেও পাকা রাস্তা। সবে হয়েছে। মিঠুনের ড্রাইভ করে ভালো লাগছিল।

খানিকটা যাবার পর বড়োমামা বললেন, “একটু দাঁড়াও এখানে।”

কয়েকজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

মিঠুন গাড়ি দাঁড় করাল। বড়োমামা গাড়ি থেকে নামলেন।

মিঠুন গলা নামিয়ে বলল, “তোমার বড়োমামা তো লোকাল ট্রেনের মতো সব স্টেশনে দাঁড়ানো শুরু করল।”

চন্দ্রিমা বলল, “জানোই তো মামা এখানে খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল। নিশ্চয়ই গ্রামে কোনও প্রবলেম হয়েছে আবার।”

বড়োমামা মিঠুনকে হাত নেড়ে ডাকলেন। চন্দ্রিমা বলল, “তোমাকে ডাকছে আবার, নিশ্চয়ই সবার সঙ্গে পরিচয় করাবে।”

মিঠুন বলল, “উফ। রিডিকিউলাস। এই গ্রামের লোকগুলো না!”

চন্দ্রিমা বলল, “প্লিজ যাও, জামাই বলে কথা। আচ্ছা চলো, আমিও যাচ্ছি।”

মিঠুন বলল, “থাক। দাঁড়াও যাই।”

মিঠুন গাড়ি থেকে নামতে চন্দ্রিমা মোবাইল বের করল। টাওয়ার ভালোই ধরে গ্রামে। তবে ফোর জি থেকে টু জি হয়ে গেছে। সে হোয়াটসঅ্যাপ খুলল। অনেকক্ষণ চেক করা হয় না। ফ্ল্যাটের বউদের গ্রুপে নতুন কী গসিপ হচ্ছে দেখতে হবে।

মোবাইলে চোখ রাখতে রাখতেই সে একটা শব্দ শুনল। মিঠুন খুব জোরে "আহ" বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

বাইরে তাকাতে চন্দ্রিমা স্থির হয়ে গেল। বড়ো একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে কে মিঠুনের গলায় চালিয়ে দিয়েছে। মিঠুন রাস্তায় কাটা পাঁঠার মতো পড়ে কাতরাচ্ছে। দরজা খুলে নেমে যে মিঠুনের দিকে দৌড়ে যাবে চন্দ্রিমার সে সময়টুকুও ছিল না। প্রবল আক্রোশে তিন-চারজন মিঠুনকে লাথি মারছে।

কয়েক মিনিট পরে দেহটা স্থির হয়ে গেল।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা সিনেমার মতো দেখছিল চন্দ্রিমা। কী হচ্ছে বুঝে উঠতে উঠতেই গোটা ব্যাপারটা হয়ে গেল। সংবিৎ ফিরল কিছুক্ষণ পর। গাড়ি থেকে নেমে বড়োমামার দিকে ছুটে গেল হাঁফাতে হাঁফাতে, "এ তুমি কী করলে?"

বড়োমামা তার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, "সিঁদুর পরিস আবার? যাক গে, মুছে ফেলবি বাড়ি গিয়ে। গাড়িতে ব্যাগ-ট্যাগ যা আছে নিয়ে নে। আমাদের গাড়িটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। যা উঠে বস। আমার কিছুক্ষণ দেরি হবে যেতে।"

চন্দ্রিমা রাস্তার উপরে বসে রইল। মিঠুনের লাশটা রাস্তার ওপরে পড়ে আছে।

চন্দ্রিমার মনে হচ্ছিল সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।

খানিকক্ষণ পরেই ঘুম থেকে উঠে পড়বে ঘামতে ঘামতে।

৩

একটা সময় ছিল যখন কল্যাণ পুজোর সময়টা শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। দু বছর হল সেটা বন্ধ হয়েছে। গ্রামে যাওয়া অনেক হ্যাপা। গিন্নি সোমার পায়ে ভেরিকোজ ভেইনের প্রবলেম আছে। সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। বসে বসে টিভিতে পুজো পরিক্রমা দেখেন।

কাজের একটা মেয়ে রাখা হয়েছে। সে পুজোতে আসেনি।

কল্যাণ নিজেই রান্না করছিলেন। ছোটো মাছ, আলু পোস্ত আর ভাত। গিন্নিকে রান্না থেকে ছুটি দিয়েছেন। পাড়ার প্যান্ডেল থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে।

সোমা ড্রয়িং রুম থেকে বললেন, "এই তোমার রান্না হয়েছে?"

কল্যাণ বললেন, "শেষের দিকে। চা চলবে?"

সোমা বললেন, "দিয়ো।"

মাছটা অল্প আঁচে দিয়ে কল্যাণ চা নিয়ে বসার ঘরে এলেন।

সোমা বললেন, "তোমার রান্না ভালো। কিন্তু একটু স্লো। কদিন পর ঠিক হয়ে যাবে।"

কল্যাণ বললেন, "তা বটে। কাজের মেয়েটা আসার আগে ঠিক হয়ে যাবে তো? তবেই হবে।"

সোমা বললেন, "দেখা যাক।"

কল্যাণ বললেন, "মেয়ে ফোন করেছিল?"

সোমা বললেন, "না এখনও করেনি। পৌঁছয়নি হয়তো।"

কল্যাণ বললেন, "মিঠুন ছেলেটা সত্যিই ভালো।"

সোমা হাসলেন, "কেন? আমাদের বাড়ি যাচ্ছে তাই?"

কল্যাণ বললেন, “তাই নয়তো কী? তোমার ভাইগুলো যা এক-একটা জিনিস! মিয়া বিবি রাজি! তেনাদের যত আপত্তি। হাস্যকর না?”

সোমা রাগলেন, “দ্যাখো, সবারই নিজেদের মেয়ে নিয়ে একটা এক্সপেক্টেশন থাকে। ওদেরও ছিল। সবাই তোমার মতো এত মুক্তমনা নয়।”

কল্যাণ বললেন, “তুমিও নও? আমাদের তো ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ ছিল। তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন? ঝামেলা তখন তো কম হয়নি।”

সোমা বললেন, “দুটো আলাদা।”

কল্যাণ বললেন, “সময়ও আলাদা। আমি মানছি আমার মেয়ের বিয়ে, তাদের কী বলো তো?”

সোমা গম্ভীর হলেন, “থাক। পুজোর দিনে এসব শুরু কোরো না।”

কল্যাণ বললেন, “ছেলেটা আজই কলকাতা ফিরবে। কত হ্যাপা!”

সোমা বললেন, “তোমার দেখি মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। মেয়ের থেকে জামাই নিয়ে বেশি ভাবো।”

কল্যাণ বললেন, “ভাবলে দোষ নেই। ছেলে হিরে।”

সোমা বললেন, “শুধু...”

কল্যাণ বললেন, “কোনও শুধু নেই। মানুষ মানুষই হয়। তুমি যাই ভাবো।”

সোমা বললেন, “মিঠুনকে ও বাড়িতে ঢুকতে দেবে? যদি পুজোর সময় ঢোকে...”

কল্যাণ বললেন, “না গেলেই ভালো হত। বারবার বারণ করেছিলাম। মেয়েটাও অদ্ভুত। অনেকদিন পর মামাবাড়ির পুজো দেখার সাধ হয়েছে। একটা সময়ের পরে যে জীবনের কোনও কোনও জানলা বন্ধ করতে হয় সেটা বোঝে না।”

সোমা চায়ের কাপ রেখে বললেন, “ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে বাঁচি।”

ফোন বাজছিল। সোমা বললেন, “দ্যাখো তো কে।”

কল্যাণ দেখলেন, বললেন, “তুমি ধরো, তোমার ভাই। আমার পোষায় না।”

সোমা রেগেমেগে ফোনটা তুললেন। কয়েক সেকেন্ড পরে ফোনটা হাত থেকে পড়ে গেল।

৪

গায়ে রক্ত লেগে ছিল অনেকখানি। শম্ভু পুকুরে নেমেছিল। দায়ের কোপ দেওয়ার সময় ছেলেটার যন্ত্রণায় কাতর অবাক মুখটা চোখে ভাসছিল তার। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সে।

বাকিরা লাশ আর গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে পুলিশকে খবর দিয়েছে। পুলিশ আসতে কিছুক্ষণ লাগবে। তাকে বাবু ছেড়ে দিয়েছেন আগেই। আসল কাজ তার যেহেতু।

শম্ভু স্নান সেরে যখন বাড়িতে এল তখন রম্পার রান্না হয়ে গেছিল। অনেকক্ষণ ধরে রক্ত ধুতে হয়। পুকুরের একদিকটা লাল হয়ে গেছে। শম্ভু ঠিক করল খেয়ে ঘুম দেবে একটা বিকেলে।

গরম ভাত আর মাংসের ঝোল। সকালে মাংস এনে রেখেছিল শম্ভু। জানত আজ মাংসের দরকার পড়বে।

রম্পা খেতে দিতে দিতে ঠান্ডা গলায় বলল, “আমার শাড়িটা বাজে লেগেছে।”

শম্ভু বলল, “আর-একটা কিনে আনিস। টাকা দিয়ে দেব।”

রম্পা অবাক গলায় শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বলল, “টাকা পেলি কোত্থেকে?”

শম্ভু হাসল, “পুজো বোনাস।”

রম্পার চোখে মুখে খুশি ফুটে উঠল, “কত টাকা?”

শম্ভু চোখ নাচাল, “বলব কেন?”

রম্পা মুখ ব্যাজার করল, “বুঝেছি। তারপর মদ খাবি। খেয়ে এসে আমাকে পিটবি।”

শম্ভু বলল, “তোর গরম কমে যাচ্ছে। মাংস খা। দুদিন পর পর মাথাব্যথা বললে সব বর পিটবে।”

রম্পা বলল, “মেয়েমানুষ তো। রোগ হবেই। রক্ত পড়ার দিনেও তোর করার ইচ্ছে জাগে। যা না খারাপ পাড়ায়। আমি কি বাধা দিয়েছি?”

শম্ভুর রাগ হওয়া উচিত ছিল। হল না। কাজগুলোর পর মাথা গরম হয় না। বলল, “যাব তো। যেখানে ইচ্ছা যাব। মাংস দে।”

রম্পা মাংসের হাঁড়ির সব মাংস শম্ভুর থালায় দিয়ে দিল।

শম্ভু রেগে বলল, “তুই খাবি না?”

রম্পা বলল, “খা তুই। তোর টাকা তুই খা।”

শম্ভু মাংস ভাতে মেখে এক গ্রাস রম্পার মুখে ধরল। রম্পা মুখ সরিয়ে নিল।

শম্ভু বলল, “খা বলছি।”

রম্পা ভাতটা খেল। বলল, “নুন কম হয়েছে তো। খাচ্ছিস কী করে?”

শম্ভু বলল, “তোর সব কিছুতে নুন বেশি খাওয়ার অভ্যাস।”

রম্পা মুখ ব্যাজার করে বলল, “আমার অনেক কিছু কেনার আছে।”

শম্ভু বলল, “বল।”

রম্পা বলল, “আমায় বলেছিলি একটা সোনার চুড়ি দিবি। দিসনি।”

শম্ভু বলল, “ওরে বাবা, সে তো অনেক টাকা।”

রম্পা বলল, “বেশি না। তুই তো টাকা পেয়েছিস।”

শম্ভু বলল, “সোনার দাম জানিস?”

রম্পা বলল, “বনার বর কি তোর থেকেও গরিব? ওকে রমেন কিনে দিল কী করে?”

শম্ভু হাসতে হাসতে বলল, “ওরে মাগি! ওটা ঝুটো সোনা। ঝুটো সোনা বুঝিস না?”

রম্পা মুখ বেঁকিয়ে বলল, “খুব বুঝি। বনার দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। আমি তো বিকেলে বাড়ির বাইরে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম বনার জন্য।”

শম্ভু রেগে বলল, “যাবি না। যাওয়ার দরকার নেই। তুই যাবি, আর দুদিন পর পর নতুন নতুন বায়না করবি। রমেন সোনার দোকানে কাজ করে। নিশ্চয়ই সোনা চুরি করে কিনে দিয়েছে।”

রম্পা বলল, “আমি কী করে জানব? যা হোক করে কিনে দিক। চুরি করুক, ডাকাতি করুক, খুন করুক।”

শম্ভু শেষ কথাটা শুনে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল, “খাবই না। খানকি মাগির জন্য আমার খাওয়া হবে না। সারাক্ষণ শুধু মাগির এটা চাই এটা চাই এটা চাই। আর যখন আমার চাই তখন মাথা ব্যথা, গুদে ব্যথা। বাল তুই মরিস না কেন?”

রম্পা ছাড়ার পাত্রী না, সেও চ্যাঁচ্যাতে শুরু করল, “তুই খানকি, তোর মা খানকি। কিছু দেবার বেলায় নেই, শুধু মারবে আর মদ গিলবে। তুই মর, তোর মা মর, তোর বাপ মর।”

শম্ভুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে রম্পাকে একটা জোরে চড় মারল। রম্পা ছিটকে পড়ল ঘরের কোনায়।

সে আরও আক্রমণাত্মকভাবে রম্পার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরের দরজায় কে জোরে ডাকাডাকি করতে লাগল, “শম্ভু দাস, বাইরে আয়।”

শম্ভু অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দেখল পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ও বাড়ির বাবুও আছেন সঙ্গে।

সকালেই আজ থানার বড়োবাবুর সঙ্গে ও বাড়িতে দেখা হয়েছিল।

“শম্ভু থানায় চ।”

শম্ভু অবাক হয়ে ও বাড়ির বাবুর দিকে তাকাল।

ও বাড়ির বাবু এগিয়ে এসে তার কানে কানে বললেন, “বেশি কিছু না। তোর নামটা কেসে রাখতে হয়েছে, নয়তো ঝামেলা হত একটু। তুই আপাতত যা। জেলে ভালোই খাওয়াদাওয়া হয়। তিন-চার মাস থাকতে হবে। তারপর জামিন হবে। তোর বউকে নিয়ে চিন্তা করিস না। আপাতত আমার গিন্নির দেখভাল করুক। খাওয়া পরার চিন্তা করতে হবে না।”

শম্ভু মাথা নাড়ল। বাবু তার ঈশ্বর। যা বলেন সেটা শোনাই তার অভ্যাস।

গাড়িতে গিয়ে উঠল সে।

রম্পা নিজেকে সামলে বেরিয়ে এসে দেখল গাড়িটা মিলিয়ে গেছে।

সে অবাক চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

৫

জীবেন সান্যাল ঠাকুরঘরে ছিলেন। প্রতিমা এবার বড়ো সুন্দর হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে মাকে দেখছিলেন।

প্রণতি এসে তাঁকে ডাকলেন, "মিষ্টি বমি করছে শুধু। চ্যাঁচামেচি করছে।"

জীবেন সান্যাল ভুরু কুঁচকে বললেন, "বড়দা ফিরেছে?"

প্রণতি বললেন, "না। বললেন, থানায় যাবেন। ফিরতে দেরি হবে।"

জীবেন বললেন, "চলো আমি যাচ্ছি।"

ঠাকুরদালান বাড়ির বাইরে। চন্দ্রিমাকে দোতলার কোনার ঘরে রাখা হয়েছে। প্রথমে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল। এবার বমি শুরু করেছে।

প্রণতি ভয়ার্ত গলায় বললেন, "এভাবে বমি করলে কিন্তু ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে।"

জীবেনবাবু বললেন, "আজকে দেওয়া যাবে না। মেয়েকে সামলাতে হবে আগে।"

প্রণতি বললেন, "মেয়ে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।"

জীবেনবাবু বললেন, "চলো দেখছি।"

দরজা বন্ধ ছিল। জীবেনবাবু দরজা ধাক্কালেন। দুজন মেয়ে চন্দ্রিমাকে সামলাচ্ছিল। কেউ একজন দরজা খুলে দিল।

জীবেনবাবু গলায় আদর ঢেলে বললেন, "কি রে মা, কেমন আছিস?"

চন্দ্রিমা চেঁচিয়ে উঠল, "ছোটোমামা, ওরা ... ওরা..."

কথা শেষ করতে পারছিল না চন্দ্রিমা। জীবেনবাবু চন্দ্রিমার পাশে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর মা।"

চন্দ্রিমা বমি করার চেষ্টা করল। বেশ খানিকটা জল ফেলল মেঝের ওপর। জীবেনবাবু স্মিত মুখে চন্দ্রিমার মাথায় অক্লান্ত হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন। প্রণতি মেয়ে দুটোকে বললেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছিস কী? মেঝেটা কে পরিষ্কার করবে?"

মেয়ে দুটো তড়িঘড়ি মেঝে মুছতে শুরু করল। জীবেনবাবু বললেন, "মার সঙ্গে কথা বলবি মিষ্টি?"

চন্দ্রিমা হাঁফাচ্ছিল। কিছু বলতে পারছিল না। জীবেনবাবু সোমাকে ফোন করলেন, দুটো রিং হতেই সোমা ধরল, "আমরা আসছি। ও ঠিক আছে তো?"

জীবেনবাবু বললেন, "কথা বল।"

ফোনটা চন্দ্রিমাকে দিলেন জীবেনবাবু। চন্দ্রিমা ফোনটা নিয়ে দেওয়ালে ছুড়ে মারল। একটা শব্দ হয়ে মোবাইলটা মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল। জীবেনবাবু সেদিকে তাকিয়ে প্রণতিকে বললেন, "ডাক্তার সাঁতরাকে খবর দাও। ঘুমের ওষুধ না দিলে মেয়েটাকে শান্ত করা যাবে না।"

প্রণতি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটা মেয়ে মোবাইলটা তুলে জীবেনবাবুর হাতে দিল। একটা দিক ভেঙে বেরিয়ে গেছে। ফোনটা গেল। জীবেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চন্দ্রিমা বলল, "বড়োমামা ওকে মেরে ফেলল। মেরে ফেলল। মেরে ফেলল।"

জীবেনবাবু মেয়ে দুটোকে ইশারায় চন্দ্রিমাকে ধরতে বলে উঠলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের ঘরে এসে ল্যান্ডলাইন থেকে দাদাকে ফোন করলেন। রিং হতেই ফোন ধরলেন সত্যেনবাবু, "কে, জীবু?"

জীবেন বললেন, "হ্যাঁ। মিষ্টিকে সামলে রাখা যাচ্ছে না। ডাক্তার সাঁতরাকে ঘুমের ওষুধ দিতে ডাকলাম।"

"ভালো করেছিস। সাঁতরাকে বলবি গ্রামের একটা ছাগলকে ওদের গাড়ি মারায় গ্রামের কয়েকজন না বুঝে ওর হাজব্যান্ডকে মারধোর করেছিল। কেসটা সেভাবেই যাবে।"

"মিষ্টি ডাক্তারের সামনে উলটোপালটা বললে?"

সত্যেন বিরক্ত হলেন, "তাহলে তুই আছিস কী করতে? ডাক্তারকে আগে থেকেই বুঝিয়ে দিবি যে চোখের সামনে ওসব দেখে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা। ওদিকে কী খবর?"

"চিন্তা নেই। মিটিয়ে এসে বলছি। তুই ওদিকটা সামলা। সোমা আর কল্যাণও আসছে।"

"শুনলাম।"

"চিন্তার কোনও কারণ নেই। কালকের মধ্যে সব ঠিক করে দেব। রাখ এখন।"

"আচ্ছা।"

জীবেন ফোন রাখলেন।

মাথার ওপর এমন দাদা থাকলে কোনও চাপকেই আর চাপ বলে মনে হয় না।

৬

সত্যেন ওসির বাড়ি এসেছেন। ছোটো ছোটো ঘর। ওসি নির্মল চৌধুরী একা থাকেন। ট্রান্সফারের চাকরি আর ছেলের স্কুলের ঝামেলা আছে বলে পরিবারকে নিয়ে বয়ে বেড়ান না।

থানায় সব কথা বলা যাবে না বলে নির্মলবাবু ওঁর বাড়িতে আসতে বলেছেন।

ডাইনিং টেবিলে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন সত্যেনবাবু। নির্মলবাবু কয়েকবার থানায় ফোন করে এসে বললেন, "ঝামেলা নেই স্যার। কেসটা দাঁড়িয়ে যাবে।"

সত্যেনবাবু বললেন, "বুঝতে পারছেন তো? আমার ভাগনিজামাই। মেরেছে গ্রামের লোক। কোনওরকম যেন হালকা না দেওয়া হয়।"

নির্মলবাবু হাসলেন, "বুঝেছি স্যার।"

সত্যেনবাবু বললেন, "শম্ভু কোথায়?"

নির্মলবাবু বললেন, "লক আপে।"

সত্যেনবাবু বললেন, "কেস কবে কোর্টে উঠবে?"

নির্মলবাবু বললেন, "পুজোর পরেই। ততদিন ও এখানেই থাকবে।"

সত্যেনবাবু বললেন, "রাখুন। আপনাকে পুজোর নেমন্তন্ন করতে এলাম। কাল থেকে আমার বাড়িতেই সেবা করবেন।"

নির্মলবাবু বললেন, "তা স্যার আবার বলতে? সেভাবে বলতে গেলে আপনিই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। নইলে এই অজ গাঁয়ে কে এত করত?"

সত্যেনবাবু বললেন, "আপনার মাইনেপত্র ব্যাংক থেকে সব ঠিকঠাক আসছে তো?"

নির্মলবাবু মাথা নাড়লেন, "তা স্যার ঠিক আছে।"

সত্যেন একটা ব্যাগ বের করে নির্মলবাবুর হাতে দিলেন, "আমি চাই আমার ভাগনিজামাইয়ের কেসের খুনিকে যত তাড়াতাড়ি ফাঁসির কাঠে দেখতে। এর জন্য যা যা করার দরকার আপনি করবেন।"

নির্মল তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিলেন। কী করবেন স্থির করতে না পেরে ফ্রিজটা খুলে ফ্রিজে ব্যাগটা রেখে দিলেন। সত্যেন সেটা দেখলেন। তাঁর ঠোঁটের কোনায় একটা বিদ্রুপের হাসি এসেই মিলিয়ে গেল। নির্মল বললেন, "স্যার চা খাবেন?"

সত্যেন বললেন, "বানাবেন?"

নির্মল বললেন, "হ্যাঁ।"

সত্যেন বললেন, "বানান। আজ দিনটা বড়ো ব্যস্ত গেল।"

নির্মল চা বসালেন। সত্যেন নির্মলের ঘর দেখতে লাগলেন। আর পাঁচটা গৃহস্থর ঘর যেমন হয় তেমনই। শুধু দরজার ওপরে রাখা খাকি উর্দিটা জানান দিচ্ছে নির্মলবাবুর পরিচয়।

সত্যেন বললেন, "আপনার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?"

নির্মল বললেন, "ক্লাস সেভেন স্যার। স্ট্যান্ড করে।"

সত্যেন খুশি হলেন, "বাহ। খুব ভালো। আপনি তো এখানেই থাকেন। ছেলের মাকে বলবেন ছেলের ওপর নজর রাখতে। এই প্রেম-ট্রেম খুব খারাপ। পরিবারের মানসম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেয়।"

নির্মল বললেন, "তা স্যার ওর মা খুব কড়া। সবে তো ক্লাস সেভেন।"

সত্যেন বললেন, "তা হোক না। এখন থেকেই নজর রাখবেন। সবেধন নীলমণি।"

নির্মল চায়ের জল বসিয়ে এসে বসলেন। বললেন, "আমাদের চাকরি তো দেখতেই পাচ্ছেন স্যার। পুজো বলে কিছু নেই আমাদের। সবসময় ডিউটি। ছেলেও বাপকে পায় না। যতটা ওর মা চেষ্টা করে আর কি।"

সত্যেন বললেন, "তা ঠিক।"

নির্মল বললেন, "আচ্ছা স্যার, শম্ভু বিশ্বস্ত তো?"

সত্যেন বললেন, "কুকুর দেখেছেন? ওয়েল ট্রেইন্ড কুকুর?"

নির্মল বললেন, "হ্যাঁ স্যার। কেন বলুন তো?"

সত্যেন হাসলেন, "এরা সব আমার কুকুরের মতো। কাল যদি বলি তোর বউকে আমার বিছানায়..."

সত্যেন চুপ করে গেলেন।

নির্মল বললেন, “বুঝেছি বুঝেছি স্যার। চিনি ক চামচ স্যার?”

সত্যেন বললেন, “লাগবে না। রক্তে শর্করা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আলাদা করে আর দিতে হবে না। যেদিন ভাগনির বিয়ে হয়েছিল, সেদিন থেকে আমার...”

নির্মল চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন, “দেখুন স্যার ঠিক আছে নাকি।”

সত্যেন চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, “বাহ ওসি সাহেব, আপনার হাত অসাধারণ। মাঝে মাঝে আপনার কাছে এসে চা খেয়ে যাব।”

নির্মল বললেন, “অবশ্যই স্যার। আমি আপনি এলে খুবই খুশি হব।”

সত্যেন আর কথা বললেন না। মন দিয়ে চা খেলেন।

চা শেষ করে কাপ নিয়ে উঠলেন। নির্মল বললেন, “না না স্যার আমি ধুয়ে নেব।”

সত্যেন বললেন, “কোনও দরকার নেই। নিজের কাজ নিজেকে করতে দিন।”

বেসিনে মন দিয়ে নিজের চায়ের কাপ ধুলেন সত্যেন। তারপর কাপটা গুছিয়ে রেখে বললেন, “আমি এলাম ওসি সাহেব। কোনও সমস্যা হলে ফোন করবেন।”

নির্মল চৌধুরী সত্যেনকে গাড়ি অবধি তুলে দিয়ে ঘরে এলেন।

ফ্রিজ থেকে প্যাকেটটা বের করলেন। প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বললেন, “শালা...”

৭

রম্পার জ্বর এসেছে। শম্ভু যখন মেরে চলে যায়, রম্পার জ্বর আসে।

মানুষটা যখন ভালোবাসে তখন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। যখন মারতে শুরু করে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। মারতে থাকে। বোঝে না যে মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল

সে আর পাঁচটা ব্যাটাছেলের মতো না যাদের সঙ্গে ও গায়ের জোর ফলায়। মুখ ছাড়া আর কোনও অস্ত্রও নেই তার।

প্রথম যেদিন হাতে মুখে রক্ত নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সেদিন তাদের বিয়ের পনেরো দিন পেরিয়েছে। অবাক হয়ে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে ছিল সে। তাকে তো বলেছিল শম্ভু ভাগচাষি। সে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "এত রক্ত কীসের?"

শম্ভু হেসে বলেছিল, "বাবুর বাড়িতে মুরগি কেটেছি। রক্ত লেগে গেছে।"

রম্পা সরল মনে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। দ্বিতীয়বারে তার কেন জানে না মনে হয়েছিল এ রক্ত মুরগির রক্ত হতে পারে না। সারারাত জেগে বসেছিল সে। অদ্ভুত একটা ভয় জাঁকিয়ে বসেছিল তার মনে। কার সঙ্গে বিয়ে হল তার?

বিয়ের তিনমাসের মাথায় একদিন মদ গিলে এসে শম্ভু গড়গড় করে বলে ফেলেছিল তাকে বিয়ের পনেরো দিনের মাথায় সে কী করেছিল। রম্পা কেঁদে উঠেছিল। কান্না শুনে শম্ভু সে কী মার তাকে! সেই প্রথম গায়ে হাত তোলা। তারপর তো কারণে অকারণে লেগেই আছে।

অথচ এমনটা হওয়ার ছিল না। তার বাবা এত ভালো কীর্তন শিল্পী। মানুষ খুঁজে খুঁজে এসে তাকে নিয়ে যেত। গ্রাম থেকে যখন সান্যালবাড়িতে কীর্তনের জন্য ডাক এল, বাবা

তাকেও নিয়ে এসেছিল। বড়ো বায়না ছিল। রম্পা সবে গান শুরু করেছে। কীর্তনের শেষে শম্ভুর সঙ্গে আলাপ। কালো শরীরটার মধ্যে কত মায়া! রম্পা লজ্জা পেত। একদিন গাঁ খুঁজে হাজির ছেলেটা। তার মাকে নিজের মা পাতিয়ে কত গল্প। বাপ আসতেই মেয়ের জন্য বিয়ের কথা পেড়ে ফেলল রম্পার মা। রম্পার বাবার ইচ্ছা ছিল না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন মেয়ে হাতের বাইরে চলে গেছে। অগত্যা মেনে নিলেন।

নিতান্ত অনাড়ম্বর বিয়ে। আশেপাশের একশো লোকও খায়নি।

কিন্তু বিয়ের পর আদর ছিল। ভালোবাসা ছিল। প্রথম মার খাবার পর রম্পা বুঝে উঠতে পারেনি কী করবে। শম্ভু বেরিয়ে যাবার পর হা হা করে কেঁদেছে। ভাবেনি বাড়ি যাবার কথা। মা কানের কাছে বারবার বলে দিয়েছে বিয়ের পর মেয়েদের কোনও বাড়ি হয় না। মন্ত্রের মতো মনে প্রবেশ করে গেছে কথাগুলো। হয় না, হয় না, হয় না। বিয়ের পর মেয়েদের কোনও বাড়ি হয় না।

রম্পা উঠল। জ্বর গায়ে শম্ভুর ফেলে যাওয়া থালাবাসন পরিষ্কার করল। সেই সকালে রান্না করেছিল। ভেবেছিল শম্ভুর খাওয়ার পর খাবে। খাওয়াটাও হল না।

রম্পা খাটে এসে শুল। মাটির ঘর। রম্পার সংসার। ঘরের বাইরে রান্না হয়। জ্বরের সঙ্গে অস্বাভাবিক মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। এরকম মাথাব্যথা হলে রম্পা ছটফট করতে থাকে। আজকে ছটফটানি হচ্ছিল না। সে মড়ার মতো শুয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর রমেনের বউ এল, “কি রে, ঘুমাস নাকি?”

দরজা খোলাই ছিল। বনা ঘরে ঢুকে গেল। রম্পা বলল, “মাথা ধরেছে রে খুব।”

বনা হেসে হেসে বলল, “শম্ভুরে তো ধরসে। শুনছস তো?”

রম্পা উত্তর দিল না। শুয়ে থাকল। মাথাব্যথার সময় কোনও কথা শুনতে ইচ্ছা করে না।

৮

রাত সাড়ে এগারোটা। কল্যাণ এবং সোমা পৌঁছলেন। সত্যেন এবং জীবেন বসে ছিলেন বৈঠকখানায়।

সোমার হাঁটতে কষ্ট হয় পায়ের জন্য। কল্যাণ সোমাকে ধরে বসালেন।

সোমা বিহ্বল চোখে দাদার দিকে তাকালেন, “জামাই?”

সত্যেন গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন।

সোমা মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

কল্যাণ বললেন, "বডি কোথায়?"

সত্যেন চমকে তাকালেন কল্যাণের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পরে সামলে বললেন, "পোস্টমর্টেম চলছে।"

সোমা সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এসেছেন। চোখ মুখ ফুলে গেছে। বললেন, "মিষ্টি কোথায়? ওর কিছু হয়নি তো?"

প্রণতি এলেন। সোমা প্রণতিকে দেখে কেঁদে উঠলেন, "এই কদিন আগে মেয়েটার বিয়ে হল।"

সত্যেন উঠলেন, "তোমরা খেয়ে নাও। আমাদের সকালে পুজোর কাজ আছে।"

কল্যাণ মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। বললেন, "মিঠুনের বাড়ির লোককে কিছুক্ষণ আগে খবর দিয়েছি। ওঁরা রওনা দিয়েছেন। কাল সকালে এসে পড়বেন।"

সত্যেনের মুখ ফ্যাকাশে হল, "বেশ তো। এত বড়ো বাড়ি। কোথাও না কোথাও জায়গা হয়ে যাবে।"

জীবেন একটু গলা খাঁকরে বললেন, "দাদা, আমাদের ফার্ম হাউসটা ফাঁকা পড়ে আছে। ওঁরা বরং ওখানে থাকুন। পুজোর বাড়িতে...।"

কল্যাণ স্থির চোখে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরাও তাহলে ওখানেই থাকব। আজ থাকা যাবে?"

প্রণতি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না না, আজ কী করে হবে, ওখানে আজ থাকা যাবে না। কাল পরিষ্কার করা হলে নাহয় দেখা যাবে।"

সত্যেন সোমার দিকে তাকালেন। বললেন, "খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নে। কী আর করবি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"

কল্যাণ বললেন, "পুলিশ কিছু করতে পারল?"

সত্যেন বললেন, "থানা খুব ভালো কাজ করেছে। কালপ্রিট বিকেলেই অ্যারেস্ট হয়েছে।"

কল্যাণ বললেন, "কালপ্রিট কে কী করে জানলে? মব লিঞ্চিং শুনলাম।"

সত্যেন বললেন, "গ্রামে একটা পাতা নড়লেও আমার কাছে খবর আসে।"

কল্যাণ কয়েক সেকেন্ড সত্যেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিষ্টির সঙ্গে দেখা করব। কোথায় ও?"

প্রণতি ইতস্তত করে বললেন, "ওকে ঘুমের ওষুধ দিতে হয়েছে। দোতলার কোনার ঘরে আছে।"

কল্যাণ সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার দোতলায় ওঠার দরকার নেই এখন। আমি দেখা করে আসছি।"

সোমা চুপ করে বসে রইলেন।

প্রণতি বললেন, "তা কী করে হয়, মিষ্টি তো এখন ঘুমাচ্ছে।"

কল্যাণ বললেন, "ঘুমাক না। মেয়ে তো আমার। দেখতে ক্ষতি কী?"

সত্যেন প্রণতিকে বললেন, "নিয়ে যাও।"

প্রণতি কল্যাণকে নিয়ে গেলেন।

জীবেন সত্যেনকে বললেন, "কাল রিংকু, পিকলুরাও আসছে।"

সত্যেন সোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "চিন্তা করিস না বোন। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সোমা বিহ্বল চোখে দাদাকে দেখল।

চন্দ্রিমা নিস্তেজ হয়ে ঘুমাচ্ছিল। ঘরে দুজন মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। ঘরের মধ্যে একটা বমির গন্ধ নাকে এল কল্যাণের। প্রণতিকে বললেন, "খুব বমি করেছে?"

প্রণতি বললেন, "হ্যাঁ দাদা। বারবার বমি করছিল মিষ্টি। শেষমেশ ডাক্তারকে ডাকতেই হল।"

কল্যাণ মেয়ের পাশে বসলেন। চুল এলোমেলো হয়ে আছে। মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। চন্দ্রিমা শিউরে উঠল ঘুমের ঘোরেই। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "মেরো না ওকে বড়োমামা, মেরো না, মেরো না বড়োমামা, মেরো না।"

কল্যাণ প্রণতির দিকে স্থির চোখে তাকালেন।

প্রণতি ব্যস্ত হয়ে "যাই, আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করি", বলে তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কল্যাণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন।

৯

ভোর পাঁচটা।

সারাদিনে যত কাজই থাক, প্রতিদিনই এই সময় ঘুম ভেঙে যায় সত্যেনের। উঠে প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো তাঁর চিরকালীন অভ্যাস। বর্ষাকালটায় নিজের ঘরেই শরীরচর্চা সেরে নেন।

পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও বার্ধক্য ধরেনি। গিন্নি জবা পাঁচ বছর আগে চলে যাবার পর (শম্ভুর বউকে বলেছিলেন গিন্নির দেখাশোনা করতে) কিছুদিন ম্রিয়মাণ ছিলেন। সেসব সামলে উঠেছেন অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই। শক্ত মনের মানুষ তিনি। শোক দুঃখ বেশিদিন কাবু করে রাখতে পারেনি।

স্পোর্টস ট্রাউজার আর টিশার্টটা পরে ঘর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানায় এসে দেখলেন কল্যাণ বসে আছেন। সত্যেন অবাক হলেন, “ঘুমাওনি?”

কল্যাণ বললেন, “বসো। কথা আছে।”

সত্যেন বললেন, “আমি তো মর্নিং ওয়াকে যেতাম।”

কল্যাণ বললেন, “কথা বলে যাবে। অসুবিধা আছে কোনও?”

সত্যেন বসলেন। বললেন, “বলো।”

কল্যাণ বললেন, “মিঠুনের বাড়ির কেউ আসবে না। কাল রাতে জানিয়ে দিয়েছে।”

সত্যেন অবাক হলেন, “কেন?”

কল্যাণ বললেন, “ওর বাড়ি থেকে বিয়েটা মেনে নেয়নি। ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা নিয়ে ওরা চিন্তিত নয়। ওর বাবা আমাকে এই ভাষাতেই কথাটা জানিয়েছেন।”

সত্যেন বললেন, “তুমি তো কাল বললে ওরা আজ আসবে। সেইমতো ফার্ম হাউস ক্লিন করতে বলে দিয়েছিলাম।”

কল্যাণ বললেন, “রাত্রে আবার ফোন করেছিল।”

সত্যেন নির্বিকার মুখে বললেন, “তাহলে এখানেই সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে?”

কল্যাণ বললেন, “কীভাবে করবে?”

সত্যেন বললেন, “ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমার কথা শেষ হয়েছে? আমাকে বেরোতে হবে।”

কল্যাণ বললেন, “শুনে কি খুশি হলে?”

সত্যেন বললেন, “কেন বলো তো?”

কল্যাণ বললেন, “এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কথা হয়ে গেছে। তুমি যেতে পারো।”

সত্যেন উঠলেন। বললেন, “মিষ্টিকে সামলাও। ওর এখন তোমাদের দরকার।”

কল্যাণ বললেন, “তা বটে। তবে আমাদের তো বয়স হচ্ছে। ওর সবার আগে মিঠুনকেই দরকার ছিল।”

সত্যেন বললেন, “বয়স কম, শোক সামলে উঠলে আর-একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”

কল্যাণ বললেন, “হুঁ। জীবন তো সরলরেখাতেই চলে, তাই না?”

সত্যেন বললেন, “আমি তো তোমাদের কাল বললাম। থানায় কথা বলা আছে। খুনির শেষ দেখে ছাড়ব আমরা।”

কল্যাণ বললেন, “রিংকুরা কখন আসছে?”

সত্যেন বললেন, “ভোরে ট্রেন হাওড়া ঢোকার কথা। এখানে দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে যাবে। রিংকু এলে মিষ্টি খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে আশা করা যায়।”

কল্যাণ বললেন, “চলো তোমার সঙ্গে আমিও হাঁটি। বহুদিন হাঁটা হয় না।”

সত্যেন বললেন, “চলো।”

দুজনে বেরোলেন। বিরাট বাড়ির সামনের ঘরে দুজন চাকর ঘুমায়। সত্যেন বেরোনোর আগে তারা জেগে যায়।

তাদের দেখে তটস্থ হয়ে দরজা খুলে দিল।

দুজনে রাস্তায় নামলেন। ভোরের দিকে হালকা একটা ঠান্ডা ভাব। সত্যেন খেতের দিকে তাকিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন।

কল্যাণ বললেন, “আজ সপ্তমী।”

সত্যেন বললেন, “হ্যাঁ, আজ থেকে চাপ বাড়বে পুজোর। গোটা গ্রাম খাবে।”

কল্যাণ বললেন, “গোটা গ্রাম কথাটা ভুল। কয়েকটা ঘর বাদ দিয়ে।”

সত্যেন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক গলায় বললেন, “গোটা গ্রামের মানুষদের ডেকেছি। তাদের বাইরে কাউকে ডাকিনি।”

কল্যাণ সত্যেনের দিকে না তাকিয়ে বললেন, “বুঝলাম। আমরা আজ চলে যাব।”

সত্যেন বললেন, “বেশ। আমারও মনে হয় মিষ্টি তোমাদের ওখানে থাকলে সামলাতে সুবিধা হবে।”

কল্যাণ বললেন, “কার সামলাতে? তোমার? কী সামলাবার কথা বলছ বলো তো?”

সত্যেন একটু থমকে বললেন, “আমি মিষ্টিকে সামলাবার কথা বলেছি।”

কল্যাণ বললেন, “ওহ। বুঝেছি। ঠিক আছে। দুপুর নাগাদ আমরা চলে যাব।”

সত্যেন কিছু বললেন না। গম্ভীর মুখে হাঁটতে থাকলেন।

১০

রম্পার ঘুম ভাঙল সাতটা নাগাদ। উঠে দেখল রাত্তিরে দরজা খোলা ছিল। মাথা এতটাই ধরেছিল যে খেয়াল ছিল না। অবশ্য আজকাল আর ভয়ও লাগে না তার। প্রথম প্রথম শম্ভু রাতে বাইরে থাকলে সারারাত জেগে থাকত। কোথাও একটু শব্দ হলে ভয়ে কাঁটা হয়ে যেত। হাতে একটা লাঠি রেখে দিত। সকাল হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

বাড়ির উঠোনে শরতের রোদ এসে পড়েছে। রম্পা উঠে বাইরে গিয়ে বসল। দাঁতন বাকি। পুজোয় কত কিছু করার কথা ছিল। সান্যালবাড়ি যাবে। পাশের গ্রামে মেলা হয়। সেখানে কত কিছু কিনবে বলে ঠিক করেছিল।

পুজোর সময়টা গ্রামের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় অনেকটাই। কেমন একটা মায়াবী হয়ে ওঠে চারপাশটা। আকাশটা নীল হয়ে আছে। ঘরের সামনের মাঠে কাশফুল ফুটেছে। সান্যালবাড়ি থেকে ঢাকের আওয়াজ আসছে। রম্পা বেশ খানিকক্ষণ সব কিছু ভুলে চুপচাপ মুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

তার একটা নেড়ি কুকুর আছে। কাল ভালো খাবার পেয়েছিল। শম্ভু সেভাবে খায়নি। অনেকটা ফেলা গেছিল। সব খেয়েছিল কুকুরটা। তাকে দেখে লোভাতুর দৃষ্টিতে লেজ নাড়াচ্ছিল। রম্পার মনখারাপ হল। ঘরে গিয়ে দেখল কিছুই নেই। বিস্কুট পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

সে দাঁতন সেরে ঘর ভেজিয়ে সান্যালবাড়ির দিকে রওনা দিল। কিছু না কিছু খাওয়া পেলেই হল। পুজোর দিনে ও বাড়িতে বসে থাকলে খাওয়ার সময় ঠিক কেউ না কেউ ডেকে নেয়।

রম্পার পিছন পিছন কুকুরটাও আসছিল। খানিকটা রাস্তা আসার পর কুকুরটা দাঁড়িয়ে গেল। অন্য এলাকা এসে গেছে। এর পর থেকে অন্য কুকুরদের রমরমা। তাকে দেখলে খেদানি খাবার সমূহ সম্ভাবনা।

ঢাকের শব্দ কাছে আসছে ধীরে ধীরে। রম্পা পা চালাল। সান্যালবাড়ির কাছে এসে দেখল বেশ কিছু লোক ভিড় করেছে। সে চুপচাপ ঠাকুরদালানের চেয়ারে গিয়ে বসল। প্রতিমাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন বউ। রম্পা সবাইকে চিনল না। পুজোর সময় অনেকেই শহর থেকে আসেন। সবাইকে তার চেনার কথাও নয়।

সত্যেন ঠাকুরদালানে তদারকি করছিলেন। তার দিকে চোখ পড়তে এগিয়ে এলেন, "তুমি শম্ভুর বউ না?"

রম্পা মাথায় ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করল। কোনও কথা বলল না।

সত্যেন হাত বাড়িয়ে একজনকে ডেকে কানে কানে কিছু বললেন। রম্পা দেখল শম্ভুরই বন্ধু দেবু। সত্যেন কথাটা বলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেবু এসে তার কানে কানে বলল, "বউদি, চিন্তার কোনও কারণ নেই, শম্ভুকে থানায় বেশিদিন রাখবে না। ছেড়ে দেবে।"

রম্পার দেবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "ঘরে কিছু নেই । চাল ডাল তরিতরকারি।"

দেবু গলা নামিয়ে বলল, "বাইরে এসো।"

রম্পা বাইরে গেল। সান্যালবাড়ির পাঁচিলের বাইরে।

দেবু পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করে বলল, “জ্যাঠা এই টাকাটা দিয়েছেন। যা যা কেনার কিনে নাও। আমি কাল গিয়ে দিয়ে আসব। এখানে এখন বারবার এসো না।”

রম্পা অবাক গলায় বলল, “কেন?”

দেবু বলল, “জ্যাঠা বলেছেন। কেসটা চলবে তো। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে।”

রম্পা বলল, “কী বলবে?”

দেবু বিরক্ত হল, “আহ, তোমাকে এখন অত বোঝাতে পারব না। শুধু বুঝে নাও, তুমি এখানে এলে শম্ভুর সমস্যা হবে।”

রম্পা বলল, “শম্ভু তো বাবুর কাছেই থাকে। আমি এলে কী হবে। ভোগের প্রসাদ খাব না বলছ?”

দেবু বলল, “আমি গিয়ে দিয়ে আসব তোমায় ভোগের প্রসাদ। ঠিক আছে? আজ বাড়ি যাও।”

দেবু বাড়ির ভিতর চলে গেল।

রম্পা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ঢাকের শব্দটা আবার দূরে যেতে শুরু করেছে।

১১

জীবেন সান্যাল হিসেব করছিলেন। সপ্তমী থেকে প্রচুর লোক খাবে। আনাজ, চাল, ডাল আসা শুরু হয়েছে। এই কটা দিন নাওয়াখাওয়া মাথায় ওঠে। অনেক নেতারাও আসবেন

সদর থেকে। সান্যালবাড়ির পুজো বলে কথা। বড়দা তাঁকে ভরসা করেন, জীবেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ভরসার মর্যাদা দেবার।

বাইরে থেকে ছেলে, ভাইঝিরা আসবে। ওদের জন্য আবার আলাদা খাবার ব্যবস্থা। জল আনাতে হচ্ছে সদর থেকে। এমনি জল খাবে না ওরা মিনারেল ওয়াটার ছাড়া। জামাইয়ের আবার হাজারখানেক বায়নাক্কা থাকবে। এটা দাও রে সেটা দাও রে। জীবেন সান্যালের মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয় এই সময়টা।

জীবেনের পাশে সত্যেন এসে বসলেন। জীবেন বললেন, "সব ঠিক আছে তো?"

সত্যেন বললেন, "মিষ্টির ঘুম ভেঙেছে।"

জীবেন বললেন, "দেখা করলি?"

সত্যেন বললেন, "হ্যাঁ।"

জীবেন বললেন, "কী বুঝলি?"

সত্যেন বললেন, "শান্ত হয়েছে। বাপ আছে মেয়ের সঙ্গে। ঠান্ডা হয়ে যাবে। আজ চলে যাবে।"

জীবেন অবাক হয়ে বললেন, "আজই? দুদিন থাকলে ভালো হত না?"

সত্যেন হালকা গলায় বললেন, "যাক, কেস থিতিয়ে যাবে। কিছুই হবে না।"

জীবেন বললেন, "তবু। মেয়ে যেরকম ভায়োলেন্ট ছিল কাল..."

সত্যেন বললেন, "থাম তো। ওর বাবা মা জানে মেয়ের ভালো কীসে। জলঘোলা করে কোনও লাভ হবে না।"

জীবেন বললেন, "বডি কী হবে?"

সত্যেন বললেন, "ও থানা থেকে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

জীবেন একটু ইতস্তত করে বললেন, “পোড়াবে?”

সত্যেন ঠান্ডা চোখে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সেটা জেনে তুই কী করবি? যা পারে করুক।”

জীবেন বললেন, “পিকলু আসছে আজ, রিংকুরও তো আসার সময় হয়ে গেল।”

সত্যেন একটু খুশি হলেন। বললেন, “হ্যাঁ। রিংকুদের ঘর গোছানো হয়ে গেছে তো?”

জীবেন বললেন, “সেসব কালই প্রণতি করে রেখেছে। ওসব নিয়ে ভাবিস না।”

সত্যেন বললেন, “শোন, আমার তো খেয়াল থাকবে না কাজের চাপে, নজর করিস শম্ভুর বউ যেন বারবার না আসে এখানে। দেবুকে বলে দিয়েছি।”

জীবেন বললেন, “সে দেখে নিচ্ছি। শম্ভুকে সদরে চালান করে দিলে বাঁচি। এখানে থাকা মানে আরও ঝামেলা বাড়বে।”

সত্যেন জীবেনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন, “শম্ভু বেঁকে বসে যদি?”

জীবেন নড়েচড়ে বসলেন, “সে তো হতেই পারে। না হবার কিছু নেই। জেলে কানে মন্ত্র দেবার লোকের কি অভাব আছে? গাঁয়ে একরকম, ওখানে গেলেই সাপের পাঁচ পা দেখাবার লোকের অভাব হবে না। তখন এই শম্ভুই দেখা গেল কোর্টে বেগড়বাঁই করে বসল।”

সত্যেন বসে বসে গম্ভীর মুখ পা নাচাতে লাগলেন। জীবেন চুপচাপ বসে রইলেন।

১২

কিছু লোক আছে যাদের নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নিজেরই ভরসা নেই। অন্য কেউ ঠিক করে না দিলে তারা বলতে পারে না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল।

দীপক লাহিড়ী বিয়ের আগে মায়ের কথায় উঠবোস করত। বিয়ের পরে নিজের জাঙিয়ার রং কী হবে, সেটাও রিংকু ঠিক করে দেয়। দীপক একটু নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। রিংকুর মুড খারাপ হলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

যশোর রোড ছেড়ে গাড়ি সান্যালবাড়ির দিকের রাস্তায় ঢোকার পরে রিংকু বলল, "শোনো, বাড়িতে একটা প্রবলেম হয়েছে। মিষ্টিদের গাড়ির নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। মিষ্টির বর আর বেঁচে নেই। তুমি আবার এই নিয়ে কোথাও কোনও বেফাঁস কথা বলে ফেলো না। বুঝেছ?"

দীপক অবাক গলায় বলল, "মিষ্টির বর বেঁচে নেই? কই আমাকে বলোনি তো?"

রিংকু গম্ভীর বলায় বলল, "এখন বলেছি তো। জেনে গেছ। কোনও প্রবলেম?"

দীপক বলল, "না। তবে ছেলেটা ভালো ছিল। খারাপ লাগছে।"

রিংকু বলল, "ভালো ছিল কী করে বুঝলে? কবার দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে?"

দীপক থতোমতো খেয়ে বলল, "না, মানে চন্দ্রিমার সঙ্গে যখন ওর অ্যাফেয়ার চলছিল তখন যেবার চন্দ্রিমা পুজোতে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়েছিল ফোনে, ভুলে গেলে?"

রিংকু বলল, "সব মনে আছে, কিন্তু মিষ্টি অনেক কিছু লুকিয়েছিল। সেটা মনে আছে তো? আর যারা লুকোয় তারা ভালো হয় কী করে?"

দীপক একটু ভীত গলায় বলল, "চন্দ্রিমা লুকিয়েছিল, মিঠুন তো আমাদের কিছু লুকোয়নি।"

রিংকু কয়েক সেকেন্ড দীপকের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, “দিন দিন তুমি একটা যা তা হয়ে যাচ্ছ। সেটা বুঝতে পারো?”

দীপক কিছু বলল না। কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল, “এবছর মেলা দেখতে যাবে তো?”

রিংকু দীপকের দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি হেনে সামলে বলল, “হ্যাঁ।”

দীপক বলল, “আমার মেলা বেশ ভালো লাগে।”

রিংকু বলল, “গিয়ে একগাদা পাঁপড়ভাজা খাবে আর পেটখারাপ করবে। এ বছর আমি যাব তোমার সঙ্গে।”

দীপক খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, “সে যেয়ো। তুমি গেলে তো আমি খুশিই হব। তোমার বাবা না গেলেই হল।”

রিংকু দীপকের দিকে তাকিয়ে বলল, “কেন? বাবা গেলে কী হবে?”

দীপক বউকে একবার মেপে বলল, “তাহলে সবাই যেরকম তটস্থ হয়ে থাকে, মেলাটা ঠিক দেখা হয়ে ওঠে না। নিজেরা নিজেরা মেলা দেখার মজাই আলাদা, তাই না?”

রিংকু বলল, “তাই কোরো। তুমি একা একাই ঘুরো। আমিও যাব না। বাবাও যাবে না। তবে পেটখারাপ করলে এবার আর ডাক্তার ডাকব না। একদম হাসপাতালের জেনারেল বেডে পাঠিয়ে দিতে বলব বাবাকে। মাঝরাতে ভূতে ধরবে।”

দীপক বলল, “হাসপাতালে ভূত আছে নাকি?”

রিংকু বলল, “না থাকলেও তোমাকে ধরবে ঠিক। এক তোমাকে দেখলাম, বউকে ছাড়া কত আনন্দে থাকো। পরশুও তো অফিসের পার্টিতে খুব খেয়েছিলে, তাই না? আমাকে অদিতি বলেছে।”

দীপক শঙ্কিত গলায় বলল, "এমন কিছু না। অদিতি শঙ্করের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে। ও তো নিজেই বলে ও প্রায়ই কনফিউজ হয়ে যায় কে শঙ্কর আর কে দীপক।"

রিংকু বলল, "সে যা ইচ্ছা করো। কিন্তু যা বললাম সেটা মাথায় রেখো। মিষ্টির সঙ্গেও এই নিয়ে কোনও কথা না। পারলে দূরে দূরে থাকবে। ওকে?"

দীপক বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল, "ওকে।"

গাড়ি সান্যালবাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। সত্যেন বাইরেই ছিলেন। রিংকু ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। দীপক গাড়ি থেকে নেমে শ্বশুরকে প্রণাম করল। সত্যেন দীপকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দিন দিন এত মোটা হয়ে যাচ্ছ কী করে? শুধু খাও আর ঘুমাও নাকি?"

দীপক কুঁচকে গেল খানিকটা, ক্যাবলার মতো হেসে বলল, "আসলে অফিসে এত চাপ থাকে, ওয়ার্ক আউট হয়ে ওঠে না।"

সত্যেন ভুরু তুললেন, "আমার থেকেও বেশি কাজ? জানো পঞ্চায়েতে কত ঝামেলা থাকে?"

দীপক শ্বশুরের সাথে কোনও তর্কে না গিয়ে হাসার চেষ্টা করল। রিংকু বলল, "পিসিরা চলে গেছে?"

সত্যেন বললেন, "না। ঘরে আছে। যাবে আজকেই।"

প্রণতি আর জীবেন এসে গেছিলেন। রিংকু আর দীপক দুজনকেই প্রণাম করল। সত্যেন বললেন, "তোরা ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। সকালের পুজোটা মিস করে গেলি।"

রিংকু বলল, "কী করব বাবা,রাস্তায় যা জ্যাম ছিল! পিকলুরা আসেনি?"

জীবেন বললেন, “রাস্তাতেই আছে। চলে আসবে যে-কোনো মুহূর্তে।”
কল্যাণ বাড়ির ভিতর থেকে ঠাকুরদালানে আসছিলেন। রিংকুকে দেখে থমকে গেলেন।
রিংকু হাসার চেষ্টা করল, “মিষ্টি শুয়ে আছে পিসেমশাই?”
কল্যাণ বললেন, “হ্যাঁ। উঠেছে। তুমি দেখা করতে গেলে যেতে পারো।”
রিংকু আমতা আমতা করে বলল, “হ্যাঁ পিসেমশাই, আমি ফ্রেশ হয়েই যাচ্ছি।”
দীপক সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে কল্যাণকে প্রণাম করল। কল্যাণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

১৩

জীবেন ঠাকুরদালানে তদারকি করছিলেন এমন সময় প্রণতি তাঁকে ডাকলেন। জীবেন বললেন, “কী হল?”
প্রণতি বললেন, “একটু এদিকে এসো।”
জীবেন প্রণতির কাছে এলেন, “কী হল?”
প্রণতি থমথমে গলায় বললেন, “পিকলুর সঙ্গে বউমার মনে হচ্ছে কোনও সমস্যা চলছে।”
জীবেন বললেন, “কেন? কী দেখে বুঝলে?”
প্রণতি বললেন, “তুমি দেখোনি? দুজনে তো কথাই বলছে না।”
জীবেন বললেন, “মরুক গে যাক, ওদের নিজেদের নিজেদের ব্যাপার, নিজেদের মিটিয়ে নিতে দাও। এদিকে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়।”

প্রণতি বললেন, "বাচ্চাটাকে এনেই ঘুম পাড়িয়ে দিল।"

জীবেন বিরক্ত হয়ে বললেন, "এতটা রাস্তা এসেছে, ক্লান্ত হয়েছে হয়তো। তুমি সব ব্যাপারে চিন্তা করছ কেন? এদিকে কত বড়ো ঝামেলা ঘোঁট পাকিয়ে আছে সেটা ভুলে গেলে?"

প্রণতি বললেন, "ঝামেলাটা তো তোমার দাদা নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। আমি বলেছিলাম ঝামেলাটা আনতে?"

জীবেন চারদিকে সন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে বললেন, "চুপ করো। বেশি জোরে কথা বোলো না। সোমার সঙ্গে কথা বলেছ?"

প্রণতি বললেন, "উনিও তো ঘরে গুমরে গুমরে কেঁদে চলেছেন। পুজো আচ্চার দিন এসব অলুক্ষুনে কাণ্ড চলছে বাড়িতে। আর সহ্য হয় না বাপু। ওদিকে আর-এক কাণ্ড হয়েছে।"

জীবেন বললেন, "কী?"

প্রণতি বললেন, "আমাদের বউমা মিষ্টির ঘরে গিয়ে বসে আছেন।"

জীবেন সচকিত হয়ে বললেন, "সে কী! এ কথা তুমি এতক্ষণ পরে বলছ? এই হল তোমাদের মেয়েমানুষের দোষ। আসল কথা পেটে রেখে যত উলটোপালটা গৌরচন্দ্রিকা করে চলেছ। পিকলুকে আমি পইপই করে বলে দিলাম বউমাকে বলে দিতে, যেন মিষ্টিদের ধারেকাছে না যায় এখন। এর মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল? চলো চলো চলো, আগে ওই ঘরে যাই।"

জীবেন তড়িঘড়ি বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। সদর থেকে দুজন নেতৃস্থানীয় লোক এসেছেন। সত্যেন বৈঠকখানায় তাঁদের সঙ্গে বসে আছেন। জীবেনকে শশব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস?"

জীবেন দুজনের দিকে তাকিয়ে সত্যেনকে বললেন, "দোতলায়।"

সত্যেন "ওহ" বলে দুজনের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জীবেন ছুটলেন। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে প্রণতিকে বললেন, "পিকলু কোথায়?"

প্রণতি বললেন, "সে তো দেখলাম কিছুক্ষণ আগে পুকুরের দিকে গেল। মাছ ধরবে নাকি!"

জীবেন বিরক্ত গলায় বললেন, "আমার হয়েছে বুড়ো বয়সে যত জ্বালা, কোথায় একটু মায়ের কাছে দু দণ্ড বসব সে খেয়াল আছে?"

প্রণতি নিচু গলায় বললেন, "আরও দাদার ধুতি ধরে চলো, এমন লক্ষ্মণ ভাই দেখিনি বাপু।"

জীবেন কড়া চোখে প্রণতির দিকে তাকালেন। প্রণতি চুপ করে গেলেন।

দরজা ভেজানো ছিল। জীবেন দরজা খুলে দেখলেন মিষ্টি, পিকলুর বউ আর কল্যাণ বসে আছে। প্রণতি হাসিমুখে বললেন, "এ কী বউমা, ভোগের ওখানে তোমাকে দরকার আর তুমি এখানে বসে আছ?"

পিকলুর বউ তনয়া হাসিমুখে বলল, "আমি একটু মিষ্টির কাছে এসে বসেছিলাম।"

জীবেন কল্যাণের দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমাদের গাড়ি দুপুরে বলা হয়েছে। দুটোর সময় রওনা দিলে ঠিক আছে?"

তনয়া অবাক গলায় বলল, "সে কী! মিষ্টি এই অবস্থায় যাবে কী করে?"

জীবেন প্রণতির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, “না মানে ওরাই তো যেতে চেয়েছিল।”
তনয়া একবার চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলল, “না না, আজকে তো কিছুতেই ওদের নিয়ে যাওয়া যাবে না। পিসেমশাই, কী করে যাবেন বলুন তো?”
তনয়া কল্যাণের দিকে তাকাল। কল্যাণ হাসার চেষ্টা করলেন, “সে ব্যবস্থা করা যাবে।”
তনয়া বলল, “না না, বাবা আপনি ক্যানসেল করে দিন। ওরা অন্তত দুদিন থাকুক, মা আপনি বাবাকে বোঝান না।”
প্রণতি কী বলবেন বুঝতে না পেরে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সেই তো, আমি তো সেটাই...”
জীবেন থমথমে মুখে একবার তনয়ার দিকে, আর-একবার প্রণতির দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
তনয়া উঠল, “চলুন মা, ভোগের ওখানে যাই।”
প্রণতি চন্দ্রিমার দিকে তাকালেন। মেয়ে মনে হচ্ছে পাথর হয়ে গেছে।

১৪

শম্ভুর ঘুম ভেঙেছে সকাল নটায়। একটা লোম ওঠা কম্বলের ওপর শুয়েছিল। শেষরাতের দিকে ঘুম এসেছে।
একই সেলে পাশের গ্রামের ঘেঁটুও আছে। ঘুম থেকে উঠে শম্ভু দেখল ঘেঁটু তার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। শম্ভু বলল, “কী হল, ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?”

ঘেঁটু বিড়ি খাচ্ছিল। একটা সুখটান দিয়ে বলল, "কত পাপ করলাম তার হিসেব করছি। নইলে পুজো আচ্চার দিনে এরকম জেলে পচতে হয়?"

শম্ভু বলল, "বিড়ি দে একটা।"

ঘেঁটু বলল, "নেই আর। ওই কনস্টেবল দাদার থেকে একটাই ম্যানেজ করতে পেরেছি। আমি একটু টেনে নি, তারপর দিচ্ছি। নইলে গুরু তোমার যা শরীর, একটান দিলেই বিড়ি শেষ হয়ে যাবে।"

শম্ভু তেজ দেখাল, "লাগবে না তোর বিড়ি। ও কাকা, কে আছ?"

বিপিন কনস্টেবল বিরক্ত গলায় এসে বলল, "কী হয়েছে?"

শম্ভু বলল, "একটা বিড়ি দাও তো।"

বিপিন পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেটটা বের করে শম্ভুর দিকে ছুড়ে মারল। শম্ভু প্যাকেটটা ক্যাচ নিয়ে একটা বিড়ি বের করে ধরাল। ঘেঁটু বলল, "এইজন্য বড়ো গাছে নৌকো বাঁধতে হয়। আমাকেও দিয়ো একটা গুরু।"

শম্ভু অবহেলাভরে বিড়ির প্যাকেটটা ঘেঁটুর দিকে ছুড়ে মারল। ঘেঁটু বলল, "দ্যাখো না গুরু একটু চা পাওয়া যায় নাকি। সকাল থেকে মনটা খুব চা চা করছে।"

বিপিন কথাটা শুনতে পেয়ে একটা খিস্তি মেরে বলল, "বেয়াইবাড়ি এসেছিস তো! এরপর বলবি একটা মেয়েছেলে জোগাড় করে দাও।"

শম্ভু খুব হাসল বিপিনের কথা শুনে। বলল, "মালটা ব্লাউজ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। শুয়ার।"

ঘেঁটুও হাসল। বলল, "মেয়েছেলের খপ্পরে পড়লে যা হয়। কান খেয়ে নিল মাগি কাল সকাল থেকে। কী করব বলো?"

শম্ভু বলল, “সব মাগি এক। দাও দাও দাও দাও। না দিলে ঝাঁপ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়বে। কী কাকা, তোমার বউ চায় না?”

বিপিন খইনি ডলছিল। শম্ভুর কথা শুনে বলল, “আমি বাইরে গেলাম। এসব কথা বলছি বড়োবাবু জানতে পারলে আমার পেছনে রুল ভরে দেবে।”

শম্ভু বলল, “আরে কিচ্ছু হবে না, তুমি দাঁড়াও। আমি আছি তো।”

বিপিন শুনল না। বেরিয়ে গেল।

ঘেঁটু গলায় এক্সট্রা এফোর্ট দিল, “দ্যাখো না ভাই, যদি সত্যেনদা আমাকেও নেন।”

শম্ভু বলল, “দাঁড়া আগে হেগে নি।”

ঘেঁটু বলল, “জল কম আছে। বালতির জল শেষ করে দিয়ো না।”

শম্ভু বিরক্ত মুখে বলল, “এইজন্য হাজত পোষায় না মাইরি। আমার আবার মাঠে না হাগলে হয় না।”

ঘেঁটু খুশি হয়ে বলল, “আমারও। মেয়েছেলেটার জন্য যত ঝামেলা হয়ে গেল।”

শম্ভু বলল, “তোর বউ?”

ঘেঁটু বলল, “মেয়েছেলে। ওই... তুমি বললে চিনবে না।”

শম্ভু বলল, “বউদি?”

ঘেঁটু মন দিয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

শম্ভু হাজতের বাথরুমে ঢুকেই বেরিয়ে এল, “ঈশ, বাঁড়া জল দিসনি?”

ঘেঁটু বলল, “বললাম না জল নেই।”

শম্ভু নাক টিপে ভেতরে ঢুকল। ঘেঁটু ফিসফিস করে বলল, “জমিদার এয়েচেন। হাজতে ওঁর ফাইভস্টারের মতো হাগতে হবে।”

খানিকক্ষণ পরে শম্ভু বেরোল।

বলল, “বউটা যে কখন আসবে।”

ঘেঁটু বলল, “তোমার বউ আসবে নাকি?”

শম্ভু বলল, “এর আগে যখন এসেছিলাম তখন এসেছিল তো।”

শম্ভু চেঁচাতে লাগল, “ও কাকা, শোনো না।”

তাদের অবাক করে নির্মলবাবু এলেন। বললেন, “কী ব্যাপার শম্ভু, কিছু বলবে?”

শম্ভু বড়োবাবুকে দেখে একটু সামলিয়ে বলল, “স্যার, বলছি আমার বউকে একটু খবর দেওয়া যাবে?”

নির্মলবাবু বললেন, “আচ্ছা, আমি সত্যেনবাবুকে বলে দিচ্ছি।”

শম্ভু খুশি হয়ে বলল, “খুব ভালো হয় স্যার, আমাকে কবে ছাড়বে স্যার?”

নির্মলবাবু হাসিমুখে বললেন, “শিগগিরি। চিন্তা কোরো না, কাল যা যা বললাম মনে আছে তো?”

শম্ভু বলল, “হ্যাঁ স্যার। বাবু আছেন যখন আমি জানি তো কোনও চিন্তা নেই। বাবু বললে বাসের সামনে গলা দিয়ে দেব।”

নির্মল বললেন, “আমরা একটা চেষ্টা চালাচ্ছি। সেরকম হলে আজ বিকেলেই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে।”

শম্ভু খুশি হয়ে বলল, “তাহলে তো ভালো হয় স্যার। বুঝতেই পারেন পুজো আচ্চার দিন।”

ঘেঁটু বলে উঠল, “স্যার আমাকেও ছেড়ে দিন না স্যার। আমিও সত্যেনবাবুকে ভোট দি।”

নির্মল কয়েক সেকেন্ড ঘেঁটুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

শম্ভু বসল।

ঘেঁটু শম্ভুর পা টিপে দিতে লাগল।

শম্ভু গম্ভীর মুখে বিড়ি টানতে লাগল।

১৫

এলাকার দুই নেতা এসেছেন। তাঁদের খেতে দেওয়া হয়েছে। লুচি, ছোলার ডাল, পায়েস, তিনরকম মিষ্টি। সত্যেন নিজে তদারকি করছিলেন।

জীবেনকে দোতলা থেকে নেমে আসতে দেখে সত্যেন বললেন, "কি রে, কী হল?"

জীবেন চোখের ইশারায় সত্যেনকে ডাকলেন। সত্যেন দেবুকে ডেকে গেস্টদের দায়িত্ব দিয়ে জীবেনের কাছে গেলেন, "কি রে, কী হল? উপরে গেলি কেন তখন হঠাৎ?"

জীবেনের শ্বাস জোরে পড়ছিল। বললেন, "একটা প্রবলেম হয়ে গেছে।"

সত্যেন বললেন, "কী প্রবলেম?"

জীবেন বললেন, "বউমা ওদের যেতে বারণ করছে।"

সত্যেন অবাক হয়ে বললেন, "মানে?"

জীবেন সংক্ষেপে বললেন, সত্যেন কয়েক সেকেন্ড বিস্মিত হয়ে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এত সাহস পায় কী করে?"

জীবেন মাথা নিচু করলেন। সত্যেন বললেন, "পিকলু কোথায়?"

জীবেন বললেন, "মনে হয় পুকুরে গেছে।"

সত্যেন বললেন, "চল।"

দুজনে বেরোলেন বাড়ি থেকে। একের পর এক গ্রামের লোক এসে ভিড় জমাচ্ছিল ঠাকুরদালানে, সত্যেন সেদিকে তাকালেন না। অন্যান্য দিন বাইরে থেকে দেখলে তাঁর রাগ বোঝা যায় না, এবারে তিনি যে বিচলিত তা বোঝা যাচ্ছিল।

সান্যালবাড়ির পেছনে বিরাট পুকুর। মাছ চাষ হয়। পিকলু চেঞ্জ না করেই মাছ ধরতে চলে এসেছে। সত্যেন আর জীবেন পৌঁছে দেখলেন পিকলু নির্লিপ্তভাবে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে।

সত্যেন বললেন, “পিকলু।”

পিকলু বলল, “বলো জেঠু। তখন তোমার সঙ্গে দেখা করা হয়নি, ব্যস্ত ছিলে দেখলাম।”

সত্যেন বললেন, “তোকে জীবেন বলেনি তনয়াকে বলার জন্য যে, মিষ্টিদের ধারেকাছে যেন ও না ঘেঁষে?”

পিকলু সত্যেনের দিকে তাকাল, “বলেছে।”

সত্যেন বললেন, “তাহলে তনয়া ওদের ঘরে কী করছিল? তুই কি জানিস তনয়া ওদের যাওয়াটা পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে?”

পিকলু বলল, “আমার সঙ্গে ওর অনেকদিন হল কথা হয় না জেঠু। তবু বাবা যখন বলেছিল তার পরে আমি ওকে হোয়াটসঅ্যাপে সেটা জানিয়ে ছিলাম। ও মেসেজ সিন অবধি করেছিল। আমি ভেবেছিলাম বুঝেছে।”

সত্যেন বললেন, “কী সব বলছিস, সিন করেছে-টরেছে এসব কী?”

পিকলু বলল, “মানে দেখেছিল।”

সত্যেন বললেন, “তোরা দুজনে কথা বলিস না? কেন?”

পিকলু একটু অস্বস্তির সঙ্গে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, “সেসব পার্সোনাল কথা।”

সত্যেন জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পার্সোনাল ব্যাপার মানে কী? পিকলুর আবার কী পার্সোনাল ব্যাপার থাকতে পারে?"

জীবেন সত্যেনের হাত ধরে শান্ত করতে চাইলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া, আমি দেখছি, পিকলু।"

পিকলু বলল, "বলো।"

জীবেন বললেন, "সেরকম বুঝলে তোর তনয়াকে এখানে আনাই উচিত হয়নি। তুই বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটার গুরুত্ব?"

পিকলু বলল, "কী করেছে তনয়া?"

জীবেন বললেন, "মিষ্টিদের থাকার ব্যাপারে জোর করেছে। অথচ ওরা আজকে চলে যেত। ঝামেলাটাও মিটে যেত। ওরা আমাদের বাড়িতে থাকা মানেই তো চোরা টেনশন কাজ করবে দাদার মনে।"

পিকলু বলল, "থাকলেই বা কী সমস্যা? বরং ওরা চলে গেলে তো ব্যাপারটা আর-একটু দৃষ্টিকটু হত, তাই না?"

সত্যেন পিকলুর চোখের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, "তোমরা বড়ো হয়েছ, ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছ, বড়োদের সিদ্ধান্তের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া শিখেছ ভালো কথা, কিন্তু মনে রেখো, ভবিষ্যতে এর ফলে যদি কোনও সমস্যা তৈরি হয়, তার সমস্ত দায় তোমাকে নিতে হবে।"

জীবেন সত্যেনকে বললেন, "আমি কি একবার কল্যাণকে বলব চলে যাওয়ার কথা?"

সত্যেন হাত তুললেন, "না। আর কাউকে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার আমি এরকম কিছু বরদাস্ত করব না। সেটা মনে রাখবি।"

সত্যেন দাঁড়ালেন না। জীবেন পিকলুকে বললেন, "দাদা রেগে গেছে বুঝতে পারলি?"

পিকলু কিছু বলল না। জীবেন বললেন, “বউমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন?”
পিকলু চোখ মুখ শক্ত করে বলল, “বললাম তো, ব্যক্তিগত ব্যাপার।”
জীবেন অবাক চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ছেলে কবে বড়ো হয়ে গেছে খেয়ালই করেননি!

১৬

শ্বশুরবাড়ি দীপকের কোনও কালেই ভালো লাগে না। সবসময় শ্বশুরের জ্ঞান শুনতে হয়। কিন্তু কিছু করার নেই। রিংকু যেতে বললে তাকে যেতেই হবে। রিংকু যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে, তবে দীপক দ্বিধায় পড়ে যাবে, সূর্য হয়তো সত্যিই পশ্চিম দিকে ওঠে। এ বাড়িতে তাদের ঘরটা সবথেকে ভালো। দোতলায়। দক্ষিণ খোলা। সামনে একটা ব্যালকনি আছে। ব্যালকনির মধ্যে চেয়ার রাখা। গ্রীষ্মকালের সন্ধেবেলা এখানে বসে চা খাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে। তাদের বিয়ে গ্রীষ্মকালেই হয়েছিল। সে বছর সে দ্বিরাগমনে এসে এই ঘরটার প্রেমে পড়ে গেছিল। কিন্তু রিংকুর প্রেমে বেশি পড়তে পারেনি। স্ত্রীর থেকে রিংকু অনেক বেশি তার বসের মতো আচরণ করে। দীপকের মা মাঝে মাঝেই দুঃখ করে বলেন এত ভালো ছাত্রটা বিয়ের পরে এমন বউয়ের ভেড়ুয়া হয়ে যাবে জানলে কিছুতেই তিনি ছেলের বিয়ে দিতেন না।রিংকু এসে ফ্রেশ হয়ে ঠাকুরদালানে চলে গেছিল। দীপক ব্যালকনিতে বসে ছিল চুপচাপ। বেশি ভিড় পোষায় না তার। যদি রিংকু ডাকে, তবেই সে নিচে যাবে। ঘরে ঢুকেই একপ্রস্থ কথা শুনতে হয়েছে রিংকুর কাছে। কেন কল্যাণকে প্রণাম করেছে সে! দীপক অবাক হয়ে

বলেছিল সবাইকেই করেছি, ওঁকে করলে সমস্যাটা কোথায়? উত্তরে রিংকু রাগি দৃষ্টি হেনে গেছে। সম্ভবত রাতে এই নিয়ে আরও কিছু হতে পারে। পুকুরের দিকে তাকাতে দীপকের চোখে পড়ল পিকলু মন দিয়ে ছিপ ফেলে বসে আছে। দীপক ঘর থেকে বেরোল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই রিংকুর সঙ্গে দেখা। রিংকু ব্যস্ত হয়ে কোথাও একটা যাচ্ছিল। তাকে দেখে বলল, “কোথায় যাবে? ঠাকুরদালানে?”দীপক বলল, “পিকলুর কাছে যাচ্ছি।”রিংকু অবাক হয়ে বলল, “পিকলু কোথায়?”দীপক বলল, “মাছ ধরছে।” রিংকু বলল, “তুমি কী করবে গিয়ে? তুমি মাছ ধরতে পারো?”দীপক বলল, “না। দেখব।”রিংকু বলল, “খেয়েছ?”দীপক বলল, “এখন খিদে নেই। রাস্তায় স্যান্ডউইচ খেলাম তো।”রিংকু বলল, “যাও, যেখানে ইচ্ছা যাও, আমার এখন একগাদা কাজ।”রিংকু ব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে গেল। দীপক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রিংকু বারণ করলে তার যাওয়া হত না।পিকলুর সঙ্গে সারাবছর তার খুব বেশি কথা হয় না। তবে এখানে এলে পিকলুর সঙ্গেই সে সাধারণত বেশি থাকে। পিকলু খাওয়াদাওয়া ভালোবাসে। সেও। দুজনে মিলে মেলায় গিয়ে গান্ডেপিন্ডে গেলে। সান্যালবাড়িতে খাওয়া নিয়ে হাজার রেস্ট্রিকশন। প্রচুর এঁটোকাটা মানা হয়। রিংকুর মধ্যেও শুচিবাই আছে।তাকে দেখে খুশি হল পিকলু, “বাড়ি তো সরগরম। কী বুঝলে?”দীপক বুঝতে না পেরে বলল, “কী বুঝব?”পিকলু অবাক হয়ে বলল, “তুমি কি এরকমই বোকা, নাকি অভিনয় করো বলো তো সবসময়?”দীপক বলল, “আমি সত্যি বুঝিনি। কোন ব্যাপারে বলছ? মিষ্টির ব্যাপারে?”পিকলু মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ। বাড়ির জামাই মরেছে অথচ বাড়িতে কারও কোনও হেলদোল নেই। লোক খাচ্ছে, পুজো হচ্ছে, সবাই হইহই করছে, সব কিছু কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?”দীপক একটু ভেবে বলল, “এতটা তো

ভাবিনি।”পিকলু বলল, “ভাবো ভাবো। না ভাবলে কী করে হবে? এখনও কত কিছু দেখার আছে জীবনে।”দীপক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, “তোমার ছেলে কেমন আছে?”পিকলু বলল, “ঘুমাচ্ছে। ভালোই আছে। তোমাদের কী খবর? পাঁচ বছর তো হল। কোনও খবরই পাচ্ছি না।”দীপক লজ্জা পেয়ে বলল, “হবে নিশ্চয়ই।”পিকলু বলল, “দিদি চায় না, তাই তো?”দীপক বলল, “না মানে ব্যাপারটা সেরকম না।”পিকলু বলল, “জেঠু কিন্তু দুনিয়াশুদ্ধ লোককে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে, শুধু নিজের মেয়ের বেলায় টুঁ শব্দটি নেই।”দীপক চুপ করে থাকল। পিকলু বলল, “মেলায় যাবে আজ?”দীপক বলল, “রিংকু যাবে বলছিল।”পিকলু বলল, “হয়ে গেল আর কি! যাও তবে ওর সঙ্গে।”দীপক একটু ইতস্তত করে বলল, “মিঠুনের বডিটা কোথায় আছে বলতে পারবে?”পিকলু দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, “পোস্টমর্টেম হচ্ছে শুনছিলাম।”দীপক বলল, “দেখতে যাবে?”পিকলু অবাক হয়ে দীপকের দিকে তাকাল। একটা মাছ ঘাই মারছিল ছিপে। সে খেয়াল করল না।

১৭

খাসির মাংস আর ভাত। ভাতের হাঁড়ি আর মাংসের কড়াই দিয়ে গেল বিপিন কনস্টেবল। সঙ্গে দুটো থালা, গ্লাস।

আয়োজন দেখে চমকে ঘেঁটু বলল, “গুরু, হাজতে খাসির মাংস? ভাবতে পারছি না যে?”

বিপিন বলল, “জামাই এসেছে না? ওর জন্যই বড়োবাবু আনালেন।”

শম্ভু একটুও অবাক হল না। মন দিয়ে থালায় মনোনিবেশ করল।

ঘেঁটু খেতে খেতে বলল, “উফ, কতদিন পরে খাসির মাংস খেলাম। শেষ খেয়েছিলাম একটা বিয়েবাড়িতে।”

শম্ভু বলল, “তোকে বলেছিল?”

ঘেঁটু বলল, “না না। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক খেয়ে আসি।”

শম্ভু বলল, “ধরা পড়লে মার খাস না?”

ঘেঁটু বলল, “উহ, মারবে, অত সোজা নাকি? উপহার নিয়ে যাই তো! চক্ষুলজ্জা বলে জিনিস আছে তো মানুষের।”

শম্ভু বলল, “মাংসটা কার জন্য খাচ্ছিস বুঝতে পারছিস তো?”

ঘেঁটু একগাল হেসে বলল, “সে আর বলতে। দুজনের জন্য এক কিলো মাংস দিয়েছে। থানায় এসেছি না বউদিবাড়ি এসেছি বুঝতেই পারছি না।”

শম্ভু বলল, “বউদিকে খুব ভালোবাসিস?”

ঘেঁটু বলল, “আমি না ভালোবাসলে কে ভালোবাসবে? দাদা তো সেই কোন মুলুকে থাকে, ন মাসে ছ মাসে একবার থাকে। আমি না দেখলে কে আর দেখবে!”

শম্ভু থালায় ভাত নিল আরও। রম্পার কথা মনে পড়ল তার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাত মাখতে শুরু করল।

ঘেঁটু বলল, “আমি গেলে বউদি আদর করে ভাত খাওয়ায়। ঘুম পাড়িয়ে দেয়। দোষের মধ্যে মাগির বড়ো বায়না। মাঝে মাঝে বড়ো ঘ্যানঘ্যান করে।”

শম্ভু বলল, “দাদা টাকা পাঠায় না?”

ঘেঁটু দাঁত বের করে বলল, “সে আর পাঠায়? দাদা দ্যাখো গে সে মুলুকে গিয়ে আবার কোনও বউদি ধরেছে।”

শম্ভু বলল, “সোনা কত করে ভরি যাচ্ছে জানিস?”

ঘেঁটু মেটে ভেঙে ভাতে মাখতে মাখতে বলল, “আমি আদার ব্যাপারী, সোনার দাম কত জানব কী করে? বড়োবাবু এলে জিজ্ঞেস করে নিয়ো।”

শম্ভু বলল, “বেটি চারদিক থেকে লোকের গয়না দেখে আসবে, আর বাড়িতে এসে খালি আমার চাই আমার চাই করবে। তাই দেব, সদর থেকে নিয়ে আসব।”

ঘেঁটু ভাত চিবোতে চিবোতে অবাক গলায়, “কে? তোমারও বউদি আছে নাকি?”

শম্ভু বিরক্ত হল, “আমার বউ।”

ঘেঁটু বলল, “তোমার বউ তো এল না দাদা।”

শম্ভু বলল, “ওর হেবি রাগ। কাল থালা ছুড়ে মেরেছিলাম তো। এখনও রাগ করে বসে আছে।”

ঘেঁটু সন্তর্পণে মাংসের কড়াই থেকে দু পিস নিতে নিতে বলল, “মেয়েমানুষের রাগ না হলে ভালো লাগে নাকি? রাগ হবে, তবেই তো মজা।”

শম্ভুর রম্পার জন্য একটু একটু মনখারাপ হচ্ছিল। আগের দিনের কথা মনে পড়ায় একটু অনুশোচনা হচ্ছিল। সে আর খেতে পারল না। থালা রেখে উঠে পড়ল।

ঘেঁটু অবাক গলায় বলল, “এ কী! এত খাবার কে খাবে এবারে?”

শম্ভু বলল, “তুই খেয়ে নে।”

ঘেঁটু আর দ্বিতীয় কোনও কথা বলল না। মন দিয়ে খেতে লাগল।

শম্ভু মুখ হাত ধুয়ে বসতে যাবে এমন সময় নির্মলবাবু এসে বললেন, “তোমার জন্য খুশির খবর আছে শম্ভু। এখনই তোমাকে ছেড়ে দেবার অর্ডার এসেছে।”

শম্ভু অবাক হল না। বলল, “এখনই বেরোব?”

নির্মলবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তোমার বন্ধুরা তোমাকে নিতে এসে গেছে।"

ঘেঁটু খেতে খেতে বলল, "আমাকেও ছেড়ে দিন না বড়োবাবু, একটা ব্লাউজের জন্য এত ঝামেলা আর পোষাচ্ছে না বিশ্বাস করুন।"

নির্মলবাবু ঘেঁটুকে ধমক দিয়ে বললেন, "মাংস ভাত দেওয়া হয়েছে তো। কোন খারাপটা আছিস তুই?"

ঘেঁটু ঘাড় চুলকে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, "সেটা মন্দ বলেননি। আচ্ছা রাতে কি মাছ হবে না মাংস?"

নির্মলবাবু কটমট করে ঘেঁটুর দিকে তাকালেন। ঘেঁটু গতিক সুবিধের নয় বুঝে মাংসে মনোনিবেশ করল।

নির্মলবাবু বিপিনকে বললেন, "শম্ভুকে ছেড়ে দিন।"

শম্ভু বেরিয়ে দেখল দেবুরা তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সে নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথাও সই করতে হবে?"

নির্মলবাবু হাসিমুখে বললেন, "না না। সাবধানে যেয়ো।"

শম্ভু দেবুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "বিলিতি খাব আজ। আমি খাওয়াব।"

দেবু বলল, "ঠেকে নিয়ে এসেছি আসার আগেই। চ গিয়ে বসি।"

শম্ভু খুশিমনে বেরোল।

থানা থেকে বেরিয়ে ধানি জমি শুরু। শম্ভু দেবুর বাইকে উঠল। চারটে বাইকে আটজন। খেত ভেদ করে বাইক চলছে।

শম্ভু বলল, "আমি একবার বাড়ি হয়ে ঠেকে যাব বুঝলি? বউটা হেবি রাগ করে আছে।"

দেবু বলল, "ঠিক আছে।"

কিছুটা গিয়ে দেবু বাইক দাঁড় করাল। শম্ভু অবাক হল, “কী হল?”
দুজন এসে সরাসরি শম্ভুর পিঠে ছুরি মারল।
শম্ভু অবাক হবার সময়টুকুও পেল না।

১৮

“তোর হাতেরটা নতুন নিলি?”
দুপুরে খাওয়ার পরে ঠাকুরদালানে তনয়াকে দেখে বলল রিংকু।
তনয়া বলল, “না তো, এটা তো আগের বছরও ছিল। দেখোনি?”
রিংকু বলল, “না তো!”
তনয়া বলল, “কোনও কারণে মিস করে গেছিলে হয়তো।”
রিংকু একটু চিন্তিত হয়ে বলল, “তাই হবে। তবে আমার তো মিস করার কথা না। গয়না হলে সবথেকে বেশি চোখ পড়ে যায় আমার।”
তনয়া হাসল, “গতবার আমরা নবমীর দিন এসেছিলাম। দুদিনে নজর পড়েনি, দেখাও তো খুব বেশি হয়নি। এসে থেকেই দেখেছিলাম তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে।”
রিংকু বলল, “তা ঠিক। সপ্তমী অবধি তাও দম ফেলবার ফুরসত থাকে। অষ্টমী, নবমী, দশমী কেমন ঝড়ের বেগে কেটে যায়।”
বাড়ির বাইরে প্যান্ডেল হয়েছে। গ্রামের লোকেরা সেখানে খাচ্ছে। সত্যেন, জীবেন ওখানেই তদারকি করছেন।
তনয়া বলল, “মিষ্টির সঙ্গে দেখা করেছ?”

রিংকু বলল, "না। কখন যাব?"

তনয়া বলল, "খারাপ লাগল ওকে দেখে।"

রিংকু তনয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "কেন খারাপ লাগল?"

তনয়া অবাক হল, "খারাপ লাগারই তো কথা, তাই না?"

রিংকু কথাটা ঘোরাতে চাইল, "তোরা ব্যাঙ্গালোরে নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করে গেছিস? এবার আমরা যাব কিন্তু।"

তনয়া বলল, "সে তো যাবেই, কতবার বলেছি তোমাদের। গত মাসে তো মিষ্টিরাও..."

কথাটা বলে তনয়া চুপ করে গেল।

রিংকু বলল, "মানে? মিষ্টিরা গেছিল?"

তনয়া থতোমতো খেয়ে বলল, "না না, ওই আর কি, আসবে আসবে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত আসেনি।"

রিংকু সন্দিগ্ধ চোখে তনয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল, তাই না?"

তনয়া হাসার চেষ্টা করল, "কোথায় আর। একবার ফোন করেছিল শুধু।"

রিংকু বলল, "বাবা জানলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।"

তনয়া বলল, "বাবা তো অনেক কিছু জানলেই কুরুক্ষেত্র হবে দিদি। দু বছর আগে অষ্টমীর দিন কী খেয়েছিলাম আমরা ভুলে গেলে?"

রিংকু বলল, "সেটা একরকম। পুজোর সময় আমার নিরামিষ একেবারেই ভালো লাগে না। কিন্তু মিঠুনের সঙ্গে তোদের যোগাযোগ ছিল, এটা শুনলে অনেক ঝামেলা হতে পারে।"

তনয়া বলল, “ঝামেলা তো সব কিছুতেই হতে পারে। তোমার ভাই আমাকে লুকিয়ে এক কলিগকে নিয়ে ঘুরতে গেছিল। আমি তো সেসব জেনে বুঝেও চুপ করে আছি। ঝামেলা করলেই ঝামেলা।”

রিংকু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “পিকলু? হতেই পারে না।”

তনয়া ম্লানমুখে হাসল। বলল, “এই কথাটা জেঠুকে বলব ভেবেছি। ভালো হয় না বললে?”

রিংকু অন্য দিকে তাকাল, “সেটা তোদের ব্যাপার। ভালো মন্দ নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে তোরা ভালো বুঝবি।”

তনয়া বলল, “সেটাই। বড়োরা তো জাত ধর্ম ঠিক করে বিয়ে দেবে। ছোটোরা সে বিয়েতে ঝামেলা হলে নিজেরা বুঝে নেবে। তাই না?”

রিংকু বলল, “বাবা জানলে তোর কি কোনও সুরাহা হবে? মনে হয় না। বাবা তোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার প্রাচীন কনজারভেটিভ পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দেবে তোর বর বিপথে গেছে তার দোষটাও আসলে তোরই। তুই-ই নিজের বরকে বেঁধে রাখতে পারিসনি। সুখী রাখতে পারিসনি।”

তনয়া হাসল, “তা ঠিক বলেছ। তবে গল্পে একটা ট্যুইস্ট আছে।”

রিংকু বলল, “কীরকম?”

তনয়া বলল, “ইদানীং আমারও একটা অ্যাফেয়ার হয়েছে। খানিকটা জোর করেই। জেদের বশে বলতে পারো। ফেসবুকে আলাপ। একদিন দেখাও করেছি ছেলেটার সঙ্গে।”

রিংকুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। একটু সামলে বলল, “পিকলু জানে?”

তনয়া বলল, “সমস্তটাই। আপাতত আমাদের যুদ্ধবিরতি চলছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না।”

রিংকু মাথায় হাত দিল।

বলল, “তোরা কি ডিভোর্সের কথা ভাবছিস? বাচ্চাটার কী হবে?”

তনয়া বলল, “জানি না। ব্যাপারটা ডেলি সোপ হয়ে যাচ্ছে না?”

রিংকু অবাক হয়ে তনয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল।

১৯

দীপককে নিয়ে সত্যেন ঠাকুরদালানে বসেছেন। দীপকের ইচ্ছা ছিল না। শ্বশুরের নজরে পড়ে গেছিল।

বিকেল সোয়া চারটে। কিছুক্ষণ আগে ব্যাচ শেষ হয়েছে। সত্যেন বললেন, “তোমার অফিস কেমন চলছে?”

দীপক বলল, “ভালো।”

জীবেন এখনও বাইরের প্যান্ডেলে আছেন। যারা পরিবেশন করছিল তারা খেতে বসেছে। সত্যেন বিড়বিড় করে বললেন, “কাল অনেক কাজ, লুচি হবে, জেলার সভাপতি আসবেন, ঘুম থেকে সকাল সকাল উঠে পড়তে হবে।”

দীপক বলল, “রাতে আমরা একটু বেরোতে পারি বাবা।”

সত্যেন সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, “তোমার একটা ট্রান্সফার হবে শুনছিলাম, সেটা কি হবে?”

দীপক বলল, "হ্যাঁ। জানুয়ারিতে। তিন বছরের জন্য একটা প্রোজেক্টে লন্ডন যাবার কথা চলছে।"

সত্যেন বললেন, "তা যাও, রিংকুকে ছ মাস পরে এসে নিয়ে যাবে?"

দীপক মাথা নাড়ল। সত্যেন বললেন, "ভালো। মেয়েটা কদিন আমার কাছে থাকুক।"

দীপক খানিকটা ইতস্তত করে বলল, "আমাদের বাড়িতে থাকার কথা বলছিল মা।"

সত্যেন দীপকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও। ঠিক আছে। আমি তোমার মার সঙ্গে কথা বলে নেব।"

দীপক মাথা নাড়ল। সত্যেন বললেন, "তোমার বাবা কেমন আছেন?"

দীপক বলল, "ভালো।"

সত্যেন বললেন, "বিদেশে যাচ্ছ, খাওয়াদাওয়া নিয়ে খুব সাবধান কিন্তু। উলটোপালটা মাংস খাবে না। সে ব্যাপারে আশা করি তোমার সম্যক ধারণা আছে।"

দীপক বলল, "আছে।"

সত্যেন বললেন, "এখন তো অনেকরকম ফ্যাশান হয়েছে। ছেলেপিলের পাখা গজাচ্ছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। তবে তোমার ওপর আমার এখনও ভরসা আছে।"

দীপক সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যেন বললেন, "ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভেবেছ?"

দীপক ঘাবড়াল খানিকটা, "ভবিষ্যৎ মানে?"

সত্যেন বললেন, "সন্তান সন্ততি কী হবে, কবে হবে কিছু ঠিক করেছ তোমরা?"

দীপক বলল, "সেটা আমি ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। যেমন চাইবে।"

সত্যেন খানিকটা বিদ্রুপের সুরে বললেন, "তাহলে তো তুমি বড়ো সমস্যায় পড়বে। নিজের মতামত রাখতে এত কুণ্ঠা কেন?"

দীপক বলল, “আমিও এ ব্যাপারে খানিকটা ওর সঙ্গে একমত।”

সত্যেন বললেন, “এত একমত হচ্ছ বলেই সংসারের রাশটা রাখতে পারছ না। পুরুষ হবে পুরুষের মতো। মেয়েদের আঁচল ধরে চলা পুরুষ আমার একেবারেই পছন্দ না। রিংকু আমার মেয়ে হতে পারে, কিন্তু আমি চাইব তুমি একজন প্রকৃত পুরুষের মতো চলাফেরা কর।”

দীপক এ কথার উত্তরে কিছু বলল না। হাসি হাসি মুখে বসে থাকল। জীবেন এসে সত্যেনের পাশে বসলেন, “তাহলে ওরা থাকছে।”

সত্যেন বললেন, “কারা?”

জীবেন দীপকের দিকে তাকালেন।

সত্যেন বললেন, “কী হয়েছে? ও তো আমার জামাই। অত চিন্তা করিস না।”

দীপকের অস্বস্তি হচ্ছিল। উঠে চলে যাবার তুমুল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে উঠতে পারছিল না।

সদর দরজা দিয়ে দেবু ঢুকল। জীবেন সত্যেনের দিকে তাকালেন। সত্যেন বললেন, “হয়েছে?”

দেবু মাথা নাড়ল। সত্যেন বললেন, “যা, হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নে।”

দেবু একবার দীপককের দিকে তাকাল। সত্যেন বললেন, “বল কী বলবি। অসুবিধা নেই।”

দেবু বলল, “বড়োবাবুকে ফোন করে দিয়েছি।”

সত্যেন বললেন, “কোনও সমস্যা হয়নি তো?”
দেবু হেসে বলল, “বুঝতেই পারেনি আগে থেকে।”
সত্যেন বললেন, “ঠিক আছে।”
দেবু বেরিয়ে গেল।
সত্যেন ফোন বের করলেন। দীপক উঠল। সত্যেন বললেন, “কোথায় যাচ্ছ?”
দীপক বলল, “ঘরে।”
সত্যেন বললেন, “আচ্ছা যাও। পরে কথা বলছি তোমার সঙ্গে।”
দীপক তড়িঘড়ি ঘরে এসে দেখল পিকলু আর রিংকু গম্ভীর মুখে বসে আছে। সে বলল, “আমি কি ঘুরে আসব?”
রিংকু বলল, “কেন ঘুরে আসবে? বসো।”
দীপক ইতস্তত করে বসল। রিংকু বলল, “এই ভদ্রলোকের কাণ্ড শুনেছ?”
দীপক বলল, “না তো।”
পিকলু বলল, “আহ দিদি, কী হচ্ছে?”
রিংকু বলল, “তুই থাম। ওই মেয়েটার সঙ্গে অ্যাফেয়ার করার সময় খেয়াল ছিল না? বাবা জানলে কী হতে পারে ভাবতে পারছিস?”
পিকলু হেসে বলল, “জেঠু জানলে তো খুশিই হবে। সারাক্ষণ পুরুষমানুষ পুরুষমানুষ বলে জ্ঞান দেয়। এসব কাজ তো পুরুষমানুষই করে।”
রিংকু একটা বালিশ ছুড়ে মারল পিকলুর দিকে। বলল, “খুব মার খাবি কিন্তু তুই। খুব পেকেছিস না? দেখ ভাই, বাচ্চার বাবা হয়েছিস, এখন সেদিকে মন দে। সব তনয়া করবে? সংসারটা তো ভাঙতেই পারিস, তারপর কী করবি?”

পিকলু দীপকের দিকে তাকাল, "ধর্মবাণী শুনে এলে নিচ থেকে? কেমন লাগছে? কান মাথা সব ভোঁ ভোঁ করছে না?"

রিংকু বলল, "এসব কী হচ্ছে পিকলু? আমার তো বাবা হয়। আমার সামনে নাহয় এসব কথা নাই বা বললি।"

পিকলু বলল, "আমার বাবাকে নিয়ে বলি? দ্যাট গ্রেট চাকর ভাই অফ মিস্টার সত্যেন সান্যাল?"

রিংকু কঠিন চোখে পিকলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

পিকলু শিস দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২০

রম্পা দুপুর রোদে হেঁটে মেলা পৌঁছেছে। নবারুণ সংঘের মাঠে মেলা হয়। তাদের গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মেলার মাঠ। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। হাতে পাঁচশো টাকার নোটটা।

একের পর এক দোকানে মেলার মাঠ জমজমাট। কেউ "হরেক মাল দশ টাকা"য় দিচ্ছে, কেউ কাশ্মীরের সোয়েটার বিক্রি করছে, কেউ আচার বিক্রি করছে, কেউ বা রংবেরঙের গেঞ্জি। রম্পা অনেক ভেবে, অনেক দর করে একশো টাকা দিয়ে একটা পাপোশ কিনল। একগাদা চুড়ি কিনতে গিয়েও কিনল না। এক দোকান থেকে একশো টাকা দিয়ে দুটো চায়ের কাপ কিনল। শম্ভুর সঙ্গে বসে নতুন কাপে চা খাওয়া যাবে।

মেলার এক কোণে সোয়েটারের দোকান। রম্পা অনেকক্ষণ সোয়েটার দেখল। একটা লাল রঙের সোয়েটার পছন্দ হল শম্ভুর জন্য। বাজেটের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মনখারাপ হল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে দরাদরি করে একটা মাফলার কিনল।

একটা পাপোশ, দুটো চায়ের কাপ আর একটা মাফলার নিয়ে রম্পা নাগরদোলার সামনে এল। কোনওবারই সে চড়তে চায় না। শম্ভু জোর করে তাকে নিয়ে উঠবে। রম্পা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।

রম্পা বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কী মনে হতে টিকেট কেটে নাগরদোলায় উঠল। অন্য সময় সে চোখ বন্ধ করে থাকে। আজ আর চোখ বন্ধ করল না। বিকেল রোদ এসে পড়ছে নাগরদোলায়। রম্পা উপরে উঠতে উঠতে দেখতে পাচ্ছে চারদিকটা কেমন পায়ের নিচে নেমে যাচ্ছে। ঘূর্ণিতে একটুও তার বমি পাচ্ছে না আর।

নাগরদোলা থেকে নেমে অনেকখানি উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটি করে যখন ক্লান্ত হল সে, আচারের দোকান থেকে তেঁতুলের আচার কিনল। মেলার ঘাসের ওপর বসে পড়ে সেই তেঁতুলের আচার খেল। মেলায় মানুষের পর মানুষ আসতে শুরু করেছে। আশেপাশের গ্রামের মানুষ সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকে এই মেলার জন্য। টাকা জমায়, ঠিক করে রাখে কী কী কিনবে মেলা এলে। বিছানার চাদর থেকে শুরু করে বাড়ি সাজানোর খুঁটিনাটি, সব কিনতে হবে এখান থেকে। অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়ে গেছে, সঙ্গে মেলার বিভিন্ন স্টল থেকে বিচিত্র সব শব্দ, কোথাও বাচ্চা হারিয়ে যাচ্ছে, কাউকে বা মেলা কমিটির অফিসে এসে দেখা করতে বলছে, কোথাও মাকড়সা মানুষ দেখা দিয়েছে, কোথাও আফ্রিকার দুর্লভ পাখি, কোথাও বা হজমি গুলিতেই মানুষের সব রোগ সেরে যাচ্ছে। কান ঝালাপালা করা এক ধরনের বাঁশি বাচ্চারা এন্তারসে বাজিয়ে চলেছে,

কোথাও চিনেবাদাম বিক্রি হচ্ছে দেদার, খাওয়ার জায়গা থেকে ভেসে আসছে এগরোল, মোগলাইয়ের গন্ধ, সব মিলিয়ে এক অপূর্ব মায়াবী অভিজ্ঞতা।

রম্পা চোখ বন্ধ করে মেলার শব্দ, গন্ধ অনুভব করল অনেকক্ষণ ধরে। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের দুচোখ ভরে দেখল। কল্পনা করার চেষ্টা করল, শম্ভুর হাত ধরে মেলায় এসেছে, তার বাচ্চা একের পর এক জিনিসের বায়না ধরছে, শম্ভু সব কিনে দিচ্ছে, আর সে ছদ্মরাগে শম্ভুকে বকে চলেছে কেন এতগুলো টাকা ফালতু খরচ করছে।

সন্ধে নামতে একগাদা পাঁপড় কিনে রম্পা মেলা থেকে বেরোল।

এক হাতে পাপোশ, চায়ের কাপ আর মাফলারের ব্যাগ, অন্য হাতে পাঁপড়ের ঠোঙা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত রম্পা যখন থানায় পৌঁছল তখন সন্ধে নেমেছে। থানার সামনে একটা ভ্যানে শম্ভুর লাশটা পরম অবহেলায় ফেলে রাখা। মুখের ওপর ভন ভন করে মাছি ঘুরছে। রম্পা প্রথমে থানার ভিতরে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী খেয়াল হতে লাশটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মুখের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে কেমন একটা কালচে দাগ পড়ে গেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রম্পা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাশটা দেখল। কিছুক্ষণ বাদে বসে পড়ল। সব প্যাকেট ধুলোয় ফেলে।

২১

দীপক ছাদে এসে দেখল পিকলু একা একা দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে দেখে বলল, “মেলায় কাল যাব। আজ আর ভাল্লাগছে না।”

দীপক বলল, “আমারও ভালো লাগছে না।”

পিকলু হেসে বলল, "নাকি দিদি বারণ করেছে বলে যাবে না?"

দীপকও হেসে ফেলল। বলল, "না না, সত্যিই ভালো লাগছে না।"

পিকলু বলল, "তোমার একটা এক্সট্রাম্যারিট্যাল অ্যাফেয়ার করা উচিত। বুঝলে?"

দীপক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "মানে?"

পিকলু বলল, "তোমার মনে জং ধরে গেছে। আরাত্রিকা সান্যাল তোমার বস হয়ে গেছে। তিনি উঠতে বললে তুমি উঠছ, বসতে বললে বসছ। দ্যাটস নট লাইফ।"

দীপক অবাক হয়ে বলল, "তুমি চাইছ তোমার দিদির সংসারটা..."

পিকলু বিরক্ত হয়ে বলল, "ধ্যাত। তুমি তো দেখছি বাংলা সিরিয়ালের বউগুলোর থেকেও বেশি সতী। দিদিকে জানিয়ে করতে কে বলেছে?"

দীপক আর-একটু সংকুচিত হয়ে বলল, "ঠিকই জেনে যাবে। তুমিও তো লুকোতে পারোনি বউয়ের কাছে।"

পিকলু সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে বলল, "আমি চাইলে ঠিকই লুকোতে পারতাম। আমি চেয়েছি ও জানুক। ম্যাড়ম্যাড়ে স্থির জলের মতো সংসারে একটা বড়ো ঢিল পড়ুক। এটা একটা লাইফ? সর্বক্ষণ একজন বিগ বসের মতো এই বাড়ি থেকে বাণী দিয়ে যাচ্ছেন, এই করবে না, ওই করবে না, এই মাংস খাবে না, ওই মাংস খাবে না, আর একদিকে সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় লাইফ!"

দীপক অবাক হয়ে বলল, "তুমিই ইচ্ছা করে জানিয়েছ?"

পিকলু বলল, "সরাসরি জানাইনি। এমনভাবে জানিয়েছি যাতে ও জানতে পারে আমি ওকে চিট করছি। রেজাল্ট ইজ অলসো স্যাটিসফ্যাক্টরি। আমার সঙ্গে ওর এখন কথা

বন্ধ। আশা করি বুঝতে পারছ, বউ কথা বন্ধ করবে, এর থেকে সুখের জিনিস আর হয় না।”

দীপক খানিকটা ভেবলে গিয়ে বলল, “যদি রাগের মাথায় উলটোপালটা কিছু করে বসত?”

পিকলু বলল, “সেই রিস্ক ফ্যাক্টরটা ছিল। তবে স্বামী অন্য মেয়ের সঙ্গে শুলে সব বউ গায়ে আগুন দেয় না। তনয়া তো একেবারেই সেই টাইপের নয়।”

দীপক বলল, “আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার একটা ছেলে হয়েছে। এখন এইসব না করলেই হত না?”

পিকলু বলল, “সেটা তো ভালো হয়েছে। ডিভোর্সের কথা ভাবতে চাইবে না কেউই।”

দীপক বলল, “ব্যাপারটা খুব জটিল।”

পিকলু বলল, “জটিল তো বটেই। এত গতে বাঁধা জীবনের থেকে জটিল জিনিসই আমার ভালো। ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি বাপটা দাদার মোসাহেবি করে আসছে। স্পাইনলেস ক্রিচারের ছেলে হয়ে এভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবার থেকে মরে যাওয়া ভালো। বিয়েটা পর্যন্ত তিনি ঠিক করে দেবেন।”দীপক বলল, “তনয়া কিন্তু যথেষ্ট ভালো মেয়ে পিকলু।”পিকলুর সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। সে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, “খারাপ কে? কেউ খারাপ না। সবাই ভালো। নিজের মাথা কাজে না লাগিয়ে দাদার কথা শুনে চলা, কিংবা... তোমার নিজের কথাই ধরো। এটা ভালো ? বউ উঠতে বললে উঠছ, বসতে বললে বসছ, এটা ভালো? তোমার কী মনে হয়?”দীপক বলল, “আমার কেমন অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে।”

পিকলু একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “যে মেয়েটা জীবিকার প্রয়োজনে সকাল বিকেল নতুন নতুন লোকের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়ে, সেও তো অভ্যাসেই শোয়, তাই না? তার সঙ্গে তোমার তফাত কী?”

দীপক চুপ করে রইল।

পিকলু বলল, “একটা লোক, সে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে, তাকে তার মুখের ওপর বলার কেউ নেই। আই হ্যাভ এনাফ ডাউটস দীপক, মিঠুনের ডেথ ইজ নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। যেভাবে বারবার আমাদের বলা হচ্ছে এই ব্যাপারে কোনও কালচার না করতে, আমার যথেষ্ট ডাউট হচ্ছে।”

দীপক একটু ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে বলল, “সেটা হয়তো তুমি মিষ্টির সঙ্গে কথা বললেই জানতে পারতে। এত গেস করতে হত না।”

পিকলু অবাক হয়ে বলল, “তুমি কথা বলেছ?”

দীপক বলল, “না।”

পিকলু বলল, “তুমি কী করে জানলে?”

দীপক চুপ করে রইল।

পিকলু সিগারেটটা ফেলে দিয়ে অস্ফুটে বলল, “শিট।”

২২

সত্যেন ঘরে বসে হিসেব করছিলেন। রিংকু বলল, “আসব বাবা?”

সত্যেন বললেন, “আয় মা। কিছু বলবি?”

রিংকু সত্যেনের খাটে এসে বসল। বলল, “তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।”

সত্যেন বললেন, “দীপকের সঙ্গে আমার কথা হল।”

রিংকু বলল, “কী ব্যাপারে বলো তো?”

সত্যেন বললেন, “ওই ছ মাস যখন ও থাকবে না, তুই তখন এখানে থাকবি।”

রিংকু খুশি হল, “তা ভালো করেছ। ওদের বাড়িতে আবার অনেক ঝামেলা।”

সত্যেন বললেন, “কী ঝামেলা?”

রিংকু বলল, “ওই আর কি!”

সত্যেন বললেন, “না না, বল, কী ঝামেলা?”

রিংকু বলল, “আরে তুমি বেশি ভেবে ফেলছ। আমি ঝামেলা বলতে এমনি বলছি। বোঝোই তো, শ্বশুরবাড়ি থাকতে কি ভালো লাগে? তাও একা একা। ওর মা একরকম, বাবা একরকম, সব সামলেসুমলে থাকা। দীপক থাকলে তাও খানিকটা সামাল দেওয়া যায়। তার ওপর ওরা খানিকটা আনকুথ। ধরো ভালো করে হয়তো আমি সোফাটা গুছিয়ে রাখলাম, বলা নেই কওয়া নেই এমনভাবে বসল যে সব এদিক সেদিক হয়ে গেল। বললে অবাক হয়ে বলবে সোফা তো সাজিয়ে রাখার জন্য না। বসার জন্যই। আমি দেখেছি দীপক না থাকলে ওর মা বিশেষ করে ইচ্ছা করে এগুলো করেন।”

সত্যেন বললেন, “তাতে কী? শ্বশুরবাড়ি মানেই তো মেয়েদের সবসময় মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। যত সমস্যাই হোক নিজেকে মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে।”

রিংকু বলল, “তুমি এখনও মান্ধাতার আমলে পড়ে আছ বাবা, দিনকাল অনেক বদলেছে। শ্বশুরবাড়ি মানেই মেয়েদের লাথি ঝ্যাঁটা খাবার দিন আর নেই এখন। অনেক আইনকানুন তৈরি হয়েছে মেয়েদের জন্য।”

সত্যেন বললেন, “ওগুলোই তো সমস্যা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন আইন ঢুকে পড়ে তখনই তো অসৎ উপায়ে লোক সেটার ব্যবহার করার কথা চিন্তা করে।”

রিংকু বলল, “সেটার পার্সেন্টেজটা আছে ঠিকই, তবে মেয়েদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতেও এই আইন দরকার ছিল।”

সত্যেন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, “কোনও অত্যাচার নয়। মেয়েদের এভাবেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। কষ্ট তো হবেই, সংসার করবে, কষ্ট হবে না? তা বলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে? ছি ছি, এ কেমন কথা?”

রিংকু বুঝল বাবা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সে কথা ঘোরানোর জন্য বলল, “মিষ্টির কী হবে বাবা?”

সত্যেন বললেন, “কী হবে?”

রিংকু বলল, “না মানে, একটা গোছানো সংসার ছিল। হঠাৎ করে এত কিছু...”

সত্যেন বললেন, “ওসব নিয়ে এত ভাবছিস কেন? ওর আমি খুব ভালো একটা বিয়ে দেব। ওদের পালটি ঘরেই।”

রিংকু বলল, “ও যদি না করতে চায়?”

সত্যেন বললেন, “ওর ইচ্ছায় হবে নাকি? অত সোজা? দেখল তো নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করলে কী হয়?”

রিংকু চুপ করে গেল।

সত্যেন বললেন, “যারা নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করে, সব নিয়মকানুন ভেঙে, তাদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। আর যেখানে যা ইচ্ছা হোক, আমার পরিবারে হবে, সেটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে, আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।”

রিংকু বলল, “তুমি কি এবারে ওদের নেমন্তন্ন করেছিলে, না ওরা নিজেরাই এসেছিল?”

সত্যেন বললেন, “আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম।”

রিংকু একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, “ব্যাপারটা নিয়ে জলঘোলা হবে না তো বাবা?”

সত্যেন বললেন, “কিচ্ছু হবে না। অত চিন্তা করিস না। তোর বাবা এখনও মরে যায়নি।”

রিংকু বলল, “এদিকে তো আর-এক সমস্যা তৈরি হয়েছে।”

সত্যেন বললেন, “পিকলুকে নিয়ে? ওকে দেখেই আমার কেমন কেমন মনে হচ্ছে।”

রিংকু বলল, “হ্যাঁ। একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।”

সত্যেন বললেন, “তা পুরুষমানুষের ওরকম এক আধটা সম্পর্ক থাকেই। সেসব নিয়ে অত চিন্তা করার কিছু নেই। ছেলে বড়ো হবে, দায়িত্ব আসবে, ধীরে ধীরে পিকলু বুঝবে সম্পর্কের মানে। ওসব নিয়ে চিন্তা করিস না।”

রিংকু বলল, “কিন্তু বাবা, তনয়াও তো...”

সত্যেন বললেন, “তনয়া? মানে?”

রিংকু বলল, “না না, কিছু না।”

সত্যেন কড়া গলায় বললেন, “আমি শুনতে পেয়েছি রিংকু, কী বলতে যাচ্ছিলি বলে ফেল।”

রিংকু ইতস্তত করে বলল, “তনয়াও জেদের বশে একটা ছেলের সঙ্গে...”

সত্যেন বললেন, “তুই কথা বলেছিস?”

রিংকু বলল, “হ্যাঁ, আমাকে তনয়াই বলল।”

সত্যেন বললেন, “আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।”

রিংকু ব্যস্ত হয়ে বলল, “না না, তুমি কেন বলবে, তাহলে ও ভাববে এইসব নিয়ে আমি তোমাকে লাগিয়েছি।”

সত্যেন গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

২৩

কল্যাণ ঘরে ঢুকে দেখলেন সোমা জেগে বসে আছেন। তিনি ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে এগারোটা বাজে। বললেন, “ঘুমের ওষুধটা খাওনি?”

সোমা বললেন, “মিষ্টি ঘুমিয়েছে?”

কল্যাণ বসলেন, “হ্যাঁ। ঘুমিয়েছে। খেয়েছেও খানিকটা।”

সোমা বললেন, “আমরা কাল চলে যাই। এখানে থেকে কী হবে?”

কল্যাণ বললেন, “তোমার দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে?”

সোমা মাথা নেড়ে না বললেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, “মিঠুনের বাড়ি থেকেও কেউ এল না। ছেলেটার কি কোনও মূল্য থাকল না কারও কাছে?”

কল্যাণ বললেন, “তোমার মনে আছে এই বাড়িতে যখন প্রথম পুজোয় এসেছিলাম আমাকে অন্য থালায় খাবার দিয়েছিল? গ্লাস থেকে শুরু করে সব কিছুই আলাদা। আমি অবাক হইনি খুব একটা। এক্সপেক্টেড ছিল। তবে এটাও আশা করেছিলাম যত দিন যাবে, সব কিছু ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়। যত দিন যাচ্ছে, সমস্ত গোঁড়ামি আরও নতুন করে ফিরে আসছে। এর শিকড় বিস্তৃত হয়ে পড়ছে কোনায় কোনায়, জানি না কে দায়ী এর জন্য? আধুনিকতা কি বড্ড বেশি একপেশে

হয়ে গেল? নাকি আসলে আমাদের ভেতরেই ওই প্রচণ্ড গোঁড়ামিটা কোথাও একটা বাসা বেঁধে ছিল, আমরা কেউ বুঝতে পারিনি? নইলে ছেলে নিজের ইচ্ছায় একটা বিয়ে করেছে বলে বাবা মা তার মৃতদেহ পর্যন্ত নিতে চাইছে না? এ কেমন গোঁড়ামি?”

সোমা বললেন, “ছেলেটা তো কিছুই মানত না। তবু...”

দরজায় কেউ নক করল। কল্যাণ বললেন, “খোলা আছে।”

পিকলু দরজা দিয়ে গলা বাড়াল, “ঘুমিয়ে পড়েছ?”

সোমা উঠে বসে ক্লান্ত গলায় বললেন, “আয় বাবা।”

পিকলু ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজাল। সোমার পাশে এসে বসে বলল, “সারাদিন পরে এখন একটু আসার সাহস পেলাম পিসি। তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ানোর সৎ সাহসটুকু হারিয়ে গেছে আসলে। মিষ্টির কাছে এখনও যেতে পারিনি।”

সোমা পিকলুর হাতটা হাতে নিয়ে কেঁদে ফেললেন। পিকলু চুপ করে বসে রইল।

কল্যাণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, “এই তো বেশ সামলে উঠেছিলে, আবার কী হল?”

পিকলু বলল, “পোস্টমর্টেম হয়েছে? বডি কোথায় আছে জানো?”

কল্যাণ বললেন, “সম্ভবত মর্গে।”

পিকলু বলল, “আমরা কিচ্ছু করতে পারি না, তাই না?”

কল্যাণ বললেন, “কী করতে পারি?”

পিকলু বলল, “আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বাড়িটা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দি।”

সোমা বললেন, “এসব বলিস না বাবা, এভাবে ভাবতে নেই।”

পিকলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সেটাই। এভাবে একজনই ভাবতে পারে। আমরা ভাবলেই বরং সেটা অস্বাভাবিক ভাবনার আওতায় পড়ে। সত্যি, কী হাস্যকর, তাই না?”

দরজাটা কেউ ধাক্কা মারল। কল্যাণ গলা তুললেন, "কে?"

কেউ সাড়া দিল না দেখে কল্যাণ বেরিয়ে দেখলেন কেউ নেই।

পিকলু বলল, "ওহ, নজরদারি চলছে। রেস্ট্রিকটেড ঘরে ঢুকে পড়েছি কিনা।"

সোমা বললেন, "বাবা, শোন, আজ তনয়া খানিকটা না বুঝেই আমাদের আটকে দিয়েছে। কালকে আমাদের আর আটকাস না। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে যাই। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি আর সহ্য করতে পারছি না, দ্যাখ তুইও আর এই ঘরে আসিস না। কী দরকার আমাদের জন্য ঝামেলায় পড়ার?"

পিকলু বলল, "আমাদের বাড়ি পিসি। এটা তোমারও বাড়ি। আমাদের প্রত্যেকটা ঘরে যাবার অধিকার আছে। কেন বলো তো ভয় পেয়ে পেয়ে কাটাতে হবে?"

কল্যাণ বললেন, "বাস্তব আর নিজের ক্ষমতাকে আমরা কতদূর অবধি অস্বীকার করতে পারি পিকলু?"

পিকলু বলল, "নিজেদের অধিকারটাকে তো আমরা বুঝে নিতে পারি, তাই না? কেন তোমরা চলে যাবে? কেন আমাকে সবসময় একটা অলিখিত নিয়মে চলতে হবে? কেন বলতে পারো?"

দরজায় কেউ নক করল।

কল্যাণ বললেন, "কে?"

ওপাশ থেকে সত্যেনের গলা ভেসে এল, "আমি।"

২৪

দীপক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।

রিংকু দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই সিগারেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল।

রিংকু অবাক হয়ে বলল, “তুমি সিগারেট খাচ্ছিলে?”

দীপক হেসে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, “না না, ওই একটাই।”

রিংকু বলল, “তুমি তো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলে। আবার ধরলে কবে?”

দীপক বলল, “পিকলুর থেকে একটা নিয়েছিলাম।”

রিংকু বলল, “এখানে এলে পিকলুর সঙ্গে এত মেলামেশা বেড়ে যায় কেন তোমার?”

দীপক কিছু বলল না।

রিংকু বলল, “এত লোক আছে, বাবা আছে, কাকা আছে, কই তাদের সঙ্গে তো বেশি দেখতে পাই না তোমায়!”

দীপক বলল, “তোমার বাবার সঙ্গে তো কথা হয়েছে আমার।”

রিংকু বলল, “সে যাই হোক। কথা হয়েছে ভালো হয়েছে। কিন্তু পিকলুর পাল্লায় পড়লে কেন?”

দীপক বলল, “পাল্লায় পড়ার কী আছে? তুমিই তো প্রথম দিকে বলতে এ বাড়িতে পিকলুর সঙ্গেই একমাত্র কথা বলা যায়, ও অনেক ফ্রেশ মাইন্ডের ছেলে।”

রিংকু বলল, “এখন বলি না। তা ছাড়া ও কেমন পালটে যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে। তোমার কানে মন্ত্র দিয়ে তোমাকেও ও চেঞ্জ করে দেবে ঠিক। তুমি জানো ওর একটা মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার আছে? তুমি নিজে তো ছ মাস লন্ডনে একা ফুর্তি করবে। আমি তো আর দেখতে পাচ্ছি না কী করবে একা একা। বলা তো যায় না কিছুই। সামনে তো এমন ভাব করে থাকো যেন ভাজা মাছটাও উলটে খেতে জানো না।”

দীপক বলল, “সেটুকু বিশ্বাস তো রাখতেই হবে তোমাকে।”

রিংকু বলল, “যে ছেলেটা তোমার একটা ছেড়ে দেওয়া নেশা এতদিন পরে আবার নতুন করে ধরাতে পারে, সে সব কিছু করতে পারে।”

দীপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “একটা কাজ করি তবে, যাওয়াটা ক্যানসেল করে দি।”

রিংকু বলল, “ক্যানসেল করবে না কী করবে সেটা তোমার ডিসিশন, তবে আমি চাইব তুমি এখানে যে কটা দিন থাকবে, পিকলুর সঙ্গে কম মিশবে। আমার ওকে একদম সহ্য হচ্ছে না এবারে।”

দীপক বলল, “আচ্ছা।”

রিংকু বলল, “তুমি জানো ও এখন পিসিদের ঘরে ঢুকেছে?”

দীপক একটু চমকাল কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, “আমি কী করে জানব, আমি তো এখানেই ছিলাম। তুমি দেখলে?”

রিংকু বলল, “হ্যাঁ, বাবার ঘর থেকে আসার সময় দেখলাম।”

দীপক বলল, “ওহ। সে তো যেতেই পারে। পিসির ঘরে যাবে এতে সমস্যা কোথায়?”

রিংকু বলল, “কোথাও সমস্যা নেই। আমি কি বলেছি কোনও সমস্যা আছে? কিন্তু ব্যাপারটা অন্য কোনও দিন গেলে তো এই নিয়ে কেউ কিছু বলত না। আজকেই যেতে হল? যখন এত বড়ো একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে? তুমি হয়তো জানো না, পিকলু হঠাৎ করে বিপথে যায়নি। ওর অফিসে বেশ কিছু প্রবলেম তৈরি হয়েছে। সম্ভবত ওর চাকরিটা নিয়ে।”

দীপক অবাক হয়ে বলল, “সেটা তোমাকে কে বলল? তনয়া?”

রিংকু বলল, "সেসব খবর দেওয়ার লোকের অভাব নেই। সব খবরই পাই। পিকলুর মধ্যে সে সব কিছু নিয়েই একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। মেন্টাল ডিস্টার্বেন্সের জন্যই ও এসব উলটোপালটা কাজ করা শুরু করেছে। তোমার এত কিছু জানার কথা না। সেজন্যই বললাম। জেনে রাখো, এবং এখন ওর থেকে দূরে থাকো।"

দীপক খাটে বসল, "আচ্ছা ঠিক আছে।"

রিংকু বলল, "দ্যাখো দীপক, তোমার থেকে আমার বাবার অনেক এক্সপেক্টেশন। তুমি জানো কি না জানি না, তবে বাবা কিন্তু তোমাকে একদম অন্য চোখে দ্যাখে। আমার তো মনে হয় বাবা তোমাকে আমার থেকেও বেশি পছন্দ করে। চেষ্টা করো বাবার কথা শুনে চলতে। অসৎ সঙ্গে পড়লে বুঝতেই পারছ, সবথেকে বেশি ক্ষতিটা আমাদেরই হবে।"

দীপক বলল, "মিষ্টির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

রিংকু চোখ ছোটো করে বলল, "হঠাৎ করে মিষ্টির কথা বললে কেন?"

দীপক বুঝল প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। সে বলল, "এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। বাড়িতে এত বড়ো একটা ব্যাপার হয়ে গেল, তাই আর কি।"

রিংকু বলল, "তোমাকে বোধহয় এ বাড়িতে আসার আগে একটা কথা বলেছিলাম। ভুলে গেছ?"

দীপক বলল, "না না, মনে আছে। বললাম তো, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।"

রিংকু গম্ভীর হয়ে বসে থাকল।

২৫

পিকলু দরজা খুলল, "এসো জেঠু।"

সত্যেন ঘরে ঢুকলেন, "তুই এই ঘরে কী করছিস?"

পিকলু বলল, "খবর নিতে এসেছিলাম, মিষ্টি কেমন আছে।"

সত্যেন পিকলুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "সেটা এত রাতে নিতে হল? তোরা এখনও ঘুমাসনি?"

সোমা উঠে বসলেন। বললেন, "বস।"

সত্যেন চেয়ারে বসে পিকলুকে বললেন, "তোর সম্পর্কে অনেক কিছু শুনলাম পিকলু।"

পিকলু যেন আকাশ থেকে পড়ল, এমন মুখ করে বলল, "কী শুনলে জেঠু?"

সত্যেন কয়েক সেকেন্ড পিকলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এমন কিছু কথা যেগুলো না শুনলেই হয়তো ভালো হত আমার।"

কল্যাণ বললেন, "তুমি ঘুমাও কখন?"

সত্যেন বললেন, "আমি ঠিক সময়ে ঘুমাই। পিকলু বলুক, আমি যেগুলো শুনেছি সে সম্পর্কে।"

পিকলু বলল, "জেঠু, আমিও একটা কথা শুনলাম।"

সত্যেন একটু রাগলেন, "তুই আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দে।"

পিকলু বললেন, "জেঠু, তুমি কি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাও?"

সত্যেন বললেন, "কথা ঘোরাচ্ছিস?"

পিকলু বলল, "না না, কথা ঘোরাব কেন, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। আসলে কী জানো তো, আমার অফিসে মিঠুনের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা বলায় আমার বস খুব খুশি হয়ে বলল, বাহ, তোমাদের গ্রামের বাড়ি তো খুব উন্নত জায়গায়। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করায়

মব গাড়িচালককে মেরে দিল আর তার সুন্দরী বউয়ের গায়ে কেউ ছুঁল পর্যন্ত না? আমাদের গ্রাম হলে তো আগে মেয়েটার গায়ে হাত পড়ত।”

সত্যেন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, “এতক্ষণ কি এইসব কথা আলোচনা হচ্ছিল?”

পিকলু হাসল, “পিসেমশাই অত আলোচনা করতে পারেন নাকি জেঠু? সেরকম লোক হলে এতক্ষণে খুনিকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতেন।”

সত্যেন কাঁপতে লাগলেন রাগে, গলা তুলে বললেন, “তোর এত বড়ো সাহস, তুই কার সঙ্গে কী বলছিস বুঝতে পারছিস?”

পিকলু অবাক হবার ভান করে বলল, “কী যে বলো না জেঠু, আমি কী বললাম বলো তো? আমি তো খুনিকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর কথা বলেছি।”

জীবেন ব্যস্ত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, “কী হল, এত রাতে এই ঘরে সবাই কেন?”

পিকলু হাসতে হাসতে বলল, “ওহ, তুমি, আমি তাই ভাবছিলাম বাবা, তুমি এতক্ষণ কোথায় পড়ে ছিলে?”

জীবেন গম্ভীর হয়ে বললেন, “তুই এই ঘর থেকে যা। রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়।”

পিকলু বলল, “ধুস, আমার তো রাত জাগা অভ্যাস আছে। তুমি বরং জেঠুকে বলো। কাল অতগুলো কাজ বাড়িতে, অঞ্জলি আছে, বড়ো বড়ো সব লোক আসবে, নিজে সুস্থ না থাকলে তো ফ্যামিলির সম্মানটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এখন তো মনে হয় ফ্যামিলির সম্মানটাই সবথেকে বড়ো কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

জীবেন গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুই ঘরে যা পিকলু। তোকে আগেও বলেছি, আবার বলছি, এখানে অযথা উলটোপালটা কথা বলবি না। তুই বোধহয় জানিস না, দাদা মিঠুনের খুনিকে শাস্তি দেবার জন্য কতটা চেষ্টা করছে।"

সত্যেন বললেন, "তুই বরং নিজের সংসার সামলা পিকলু। নিজের বউ অন্য ছেলের সঙ্গে দেখা করছে, ছি ছি ছি। সান্যাল বংশের সম্মান এভাবে বাজারে বিক্রি হয়ে গেল! মিষ্টির কথা তোর না ভাবলেও চলবে। মিঠুনের খুনি উপযুক্ত সাজা পেয়েছে। তুই বরং নিজের দিকে তাকা। তোর লজ্জা হওয়া উচিত।"জীবেন অবাক হয়ে সত্যেনের দিকে তাকালেন।

পিকলু জীবেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, তুমি সবসময় সাইলেন্ট মুভির সাইড ক্যারেক্টার প্লে করো, ভালো লাগে তোমার?"

কল্যাণ পিকলুকে থামালেন, "পিকলু, আমার মনে হয় তোমার ঘরে যাওয়া উচিত। এত রাতে সোমার উত্তেজনা ভালো নয়। ইন ফ্যাক্ট, সবাই ঘরে গেলেই বোধহয় ভালো হয়।"

সত্যেনের জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল, কল্যাণকে বললেন, "তোমাদের যদি মনে হয়, আমার বাড়িতে থেকে, আমার বিরুদ্ধেই কন্সপিরেসি করবে, তাহলে কিন্তু তোমরা ভুল ভেবেছ, আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, থাকছ, খাওয়াদাওয়া করছ, ব্যস। পারলে কালকেই তোমরা বিদেয় হও। সান্যালবাড়িতে যারা ঢুকতে কোনও দিন সাহস পেত না, তাদের বাড়িতে ঢোকালে কী হয়, তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।"

সোমা বললেন, "এটা তুই কী বললি দাদা?"

সত্যেন একবার কড়া চোখে পিকলুর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পিকলু জীবেনকে বলল, "জেঠুকে একটা কথা বলা হল না বাবা।"

জীবেন ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। কোনও মতে বললেন, “কী?”
পিকলু বলল, “আমার এক বন্ধু, পুলিশে একটু ওপরের দিকের অফিসার। ওকে মিঠুনের ব্যাপারটা বলেছি। ব্যাপারটা লোকাল থানা দিয়ে মিটবে না বোধহয় আর। পারলে ঘুমোতে যাবার আগে জেঠুকে খবরটা জানিয়ে দিয়ো, ঘুমটা ভালো হবে। মিঠুনের খুনির শাস্তি হোক, সবথেকে বেশি বোধহয় জেঠুই চায়, তাই না?”
জীবেন চমকে পিকলুর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছিল।

২৬

পিকলু আসেনি দেখে তনয়া দরজা ছিটকিনি না দিয়ে ভেজিয়ে শুয়েছিল। বাচ্চাটা কাঁদছিল। সামলেসুমলে ঘুম পাড়িয়ে মোবাইলটা খুলল। অবনীশ বেশ কয়েকবার পিং করেছে।
তনয়া লিখল, “সরি। বিজি ছিলাম।”
অবনীশ লিখল, “অনেক কাজ করতে হয়?”
তনয়া নিজের মনে হেসে লিখল, “হয়। সংসার মানেই অনেক কাজ।”
“চলে এসো আমার কাছে। কিচ্ছু করতে হবে না।” অবনীশ একদিনের দেখাতেই তার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। সর্বক্ষণ শুধু একই কথা। তনয়া চেষ্টা করে চলেছে এই প্রবল ইচ্ছাকে বাঁধ দিয়ে দমিয়ে রাখতে।
তনয়া একটা স্মাইলি দিয়ে বলল, “আমার বরও একই কথা বলত।”

"আমাকে তোমার বরের মতো ভেবো না। আমি আলাদা।" অবনীশের মুখটা মানসচোখে দেখতে পেল তনয়া।

সে লিখল, "পৃথিবীর সব পুরুষই তাই ভাবে। বলো?"

"আমি ভাবি না, আমি যা, আমি তাই।"

"একজ্যাক্টলি, এটাই সবাই ভাবে।"

"ওহ। প্লিজ। তোমরা মেয়েরা চিরকাল এত কনজারভেটিভ হলে কী করে হবে বলো তো?" অবনীশ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

"ভাগ্যিস কনজারভেটিভ। তাই হয়তো খানিকটা ব্যালান্স থাকল।" তনয়া অনেকটা ভেবে লিখল।

"কীসের ব্যালান্স?" অবনীশ যেন কিছুই বোঝে না।

তনয়া লিখল, "বুঝবে না। সব কথা বুঝে কী করবে?"

দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল পিকলু। তনয়া মেসেঞ্জার বন্ধ করল না।

পিকলু ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাক, ব্যাটা ঘুমিয়েছে।"

বেশ কিছুদিন হল পিকলুর সঙ্গে তনয়ার কথা নেই।

তনয়া ভেবেছিল এখনও পিকলু কিছু বলবে না। তাকে চমকে দিয়ে বলল, "অবনীশের কথা দিদিকে বলেছ নিশ্চয়ই?"

তনয়া এতটা জোরে চমকাল যে ফোনটা তার হাত থেকে খাটের ওপর পড়ে গেল। একটু সামলে বলল, "হ্যাঁ, বলেছি।"

পিকলু বলল, "কাল আনন্দবাজারে বেরোবে। ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমনও হতে পারে। বাড়ির আর কারও জানার বাকি নেই।"

তনয়া ঠোঁট কামড়াল। বলল, "আমি অত ভেবে কিছু বলিনি।"

পিকলু বলল, "বলা উচিত।"

তনয়া কিছুক্ষণ পিকলুর দিকে তাকিয়ে থাকল। কোত্থেকে যেন চোখে জল চলে এল, "তোমারও বলা উচিত ছিল আমাকে। তুমি কী করে করলে ওটা?"

পিকলু তনয়াকে কাঁদতে দিল। বেশ খানিকক্ষণ পর বলল, "মানুষ তো। মানুষের কিছু জৈবিক প্রবৃত্তি থাকে। আমি তোমার কাছে সাফাই গাইব না। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি খানিকটা বয়ে গেছিলাম, নিজেই চেয়েছিলাম হয়তো।"

তনয়া চুপ করে থাকল।

পিকলু বলল, "আমাদের বাড়ির পরিস্থিতি আমাদের সম্পর্কের থেকেও অনেক গুণ জটিল তনয়া। তুমি কি সেটা বুঝতে পারছ?"

তনয়া বলল, "আমার মাথায় কিছুই আসছে না।"

পিকলু বলল, "একটা লোক, তাকে তার অসংখ্য কুসংস্কার আর গোঁড়ামির সঙ্গে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে খোলা বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে প্রভূত ক্ষমতা পেয়ে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে। তাকে সাহায্য করার জন্য আছে আমার নিজের বাবা, যে প্রত্যেকটা নির্দেশ পরম ভক্তিভরে পালন করে চলেছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সম্পূর্ণ লড়াইটাই ভীষণ অসম। এই সময় কি আমরা একটা যুদ্ধবিরতি নিতে পারি?"

তনয়া পিকলুর চোখে চোখ রেখে বলল, "যুদ্ধবিরতির পরে আমরা আবার যুদ্ধ করব?"

পিকলু বলল, "যুদ্ধ তো হয় সমানে সমানে। আমি তোমার কাছে প্রথম থেকেই তো হেরে গেছি।"

তনয়া চুপ করে রইল।

পিকলু বলল, “জানতে চাইলে না, কীভাবে যুদ্ধ করব?”

তনয়া বলল, “তুমিই জানো।”

পিকলু বলল, “আচ্ছা, তুমি অবনীশের সঙ্গে আবার কথা বলতে পারো, আমি ঘুমিয়ে পড়ি।”

তনয়া হঠাৎ পিকলুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল, “তুমি এমন অদ্ভুত কেন? কেন? কেন?”

পিকলু তনয়াকে বুকের কাছে নিয়ে তনয়ার কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, “মানুষ বলে।”

২৭

মেলায় টহল দিয়ে নির্মল চৌধুরী ঠিক করলেন ঘরে ফিরে একটু শুয়ে নেবেন। থানার মেজোবাবুকে দায়িত্ব দিয়ে নির্মলবাবুর বাড়ির সামনে যখন গাড়িটা দাঁড়াল তখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে।

কনস্টেবল বিকাশ সাহা বলল, “স্যার, আপনার বাড়ির বাইরে কে বসে আছে?”

নির্মল গাড়ি থেকে নেমে অবাক হলেন। বললেন, “কে বলো তো?”

বিপিন গাড়ি থেকে এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে বলল, “শম্ভুর বউ স্যার।”

নির্মল বললেন, “এখানে কী করছে? আচ্ছা, তোমরা বেরিয়ে যাও, আমি দেখছি।”

গাড়িটা বড়োবাবুকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘরের চাবি পকেটেই থাকে নির্মলবাবুর। চাবি বের করে ঘরের দরজা খুলতে এগোলেন।

তাঁকে দেখে রম্পা উঠে দাঁড়াল।

নির্মলবাবু বললেন, "এখানে কী চাই?"

রম্পা বলল, "বিচার চাই বাবু।"বাড়ির বাইরের একশো পাওয়ারের বালবে রম্পার অবিন্যস্ত পোশাক দেখে নির্মল চ্যাঁচ্যাতে গিয়েও থমকে গেলেন। দরজা খুলে বললেন, "আয়, ঘরে আয়।"রম্পা ধরা গলায় বলল, "বিচার চাই বাবু। বিচার দ্যান।"নির্মল ঘরের ভিতর ঢুকে আলো জ্বালিয়ে সোফায় বসলেন। পিছন পিছন রম্পা ঢুকে মেঝেতে বসল। নির্মলের মনে পড়ে গেল বহুদিন বাড়ি যাওয়া হয় না। বউয়ের সঙ্গে কতদিন... নির্মল দীর্ঘশ্বাস ফেলে রম্পার দিকে তাকালেন। এখানে মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। কত আর বয়স হবে মেয়েটার। খুব বেশি হলে তেইশ চব্বিশ। পাশের বাড়িটাও তাঁর বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ভিতরের পুরুষমানুষটা জেগে উঠছিল একটু একটু করে। নির্মল একটু সামলে দরজাটা বন্ধ করে সোফায় বসে বললেন, "নিচে বসিস না, ঠান্ডা লেগে যাবে, উপরে আয়।"

রম্পা গোঁজ হয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "বিচার চাই, বিচার চাই।"

নির্মল উঠে রম্পাকে ধরে তুলতে গেলেন, রম্পা ছিটকে গেল না, নির্মল খানিকটা উৎসাহিত হয়ে রম্পাকে সোফায় এনে বসালেন। শাড়ির আঁচল খসে গেছে, নির্মলের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছিল। রম্পার পিঠে হাত রাখলেন, "আমরা তো আছি, আমি আছি, তোদের বাবু আছেন, সবাই আছে।"

রম্পা বলল, "সবাই বলল, কোনও ভয় নেই, শম্ভু যাবে, ফিরেও আসবে, কিন্তু শম্ভু ফিরল না আর। ওকে কে মেরেছে? সবার বিচার করতে হবে।"

নির্মল নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, রম্পাকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

রম্পা প্রাণপণে নির্মলকে ধাক্কা মারল। নির্মল ভেবেছিলেন রম্পা বাধা দেবে না। হঠাৎ করে ধাক্কা লাগায় জেদ চেপে গেল তাঁর। বললেন, "শোন, আমিই তোকে বিচার দিতে পারব, আর কেউ পারবে না, এদিকে আয়।"

রম্পা বিহ্বল চোখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরোতে গেল। নির্মল সোফা থেকে উঠে রম্পাকে আটকাতে গেলেন। রম্পা নির্মলকে আবার ধাক্কা দিতে গেল, এইবারে নির্মল প্রস্তুত ছিলেন, রম্পার আক্রমণ প্রতিহত করে ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

রম্পা জোরে চেঁচিয়ে উঠল, নির্মল রম্পার মুখে হাত দিতে গেলেন, রম্পা নির্মলের হাতে কামড়ে দিল। নির্মল এবার মরিয়ে হয়ে উঠলেন, রম্পার গালে কষিয়ে এক চড় মারলেন।

রম্পা ছিটকে পড়ল ঘরের কোণে। দিনের পর দিন শম্ভুর চড় খেয়ে সেও অভ্যস্ত হয়ে গেছিল, সামলে উঠতে একটুও সময় না নিয়ে পরমুহূর্তেই উঠে প্রাণপণে চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। নির্মল দরজা আটকে দাঁড়ালেন। সার্ভিস রিভলভার বের করে রম্পাকে বললেন, "জানে মেরে দেব, একদম জানে মেরে দেব।"

রম্পা ফাঁদে পড়া বিড়ালের মতো নির্মলের দিকে তাকিয়ে ফুঁসতে লাগল। হাতের কাছে একটা ফুলদানি ছিল, নির্মলের দিকে ছুড়ে মারল।

নির্মল প্রস্তুত ছিলেন না। ফুলদানিটা কপালে এসে লাগল। বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। কপাল থেকে রক্ত বেরোনো শুরু হয়েছে। টেবিলের ওপর আর-একটা ফুলদানি ছিল। রম্পা দৌড়ে এসে গায়ের সমস্ত জোর একত্রিত করে সম্মান বাঁচাবার তাগিদে

নির্মলের মাথায় বারবার আঘাত করতে শুরু করল। নির্মল আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না।

রম্পাকে তাক করে তাঁর রিভলভার গর্জে উঠল। রাতের নিস্তব্ধতা মুহূর্তের মধ্যে খানখান হয়ে গেল। রম্পা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

নির্মলের মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনি উঠতে গিয়েও মেঝেতে পড়ে গেলেন।

২৮

প্রণতি দেখলেন জীবেন একটু উত্তেজিত হয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

চোখে ঘুম লেগে এসেছিল প্রণতির। জীবেনকে উত্তেজিত দেখে উঠে বসলেন, "কী হল আবার?"

জীবেন ঘামছিলেন।

খাটে বসে বললেন, "পিকলু কেমন একটা হয়ে গেছে। দাদার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলছে, আর..."

প্রণতি বললেন, "আর মানে? আর মানে কী বলতে চাইছ?"

জীবেন প্রণতির দিকে তাকালেন, "ও পুলিশের ওপরমহলে মিঠুনের ব্যাপারে জানিয়েছে। ব্যাপারটা নাকি নতুন করে তদন্ত হবে।"

প্রণতি বললেন, "দাদা কী বলছে এটা শুনে?"

জীবেন বললেন, "দাদা জানে না। দাদা বেরোনোর পর পিকলু আমাকে বলেছে। দাদাকে রাতে আর বলব না। এমনিতেই খুব কথা কাটাকাটি হল। সকালে বলব নাহয়।"

প্রণতি ধরা গলায় বললেন, "আমার ছেলেটার কোনও ক্ষতি করে দেবে না তো দাদা?"

জীবেন গম্ভীর হলেন, বললেন, "আমাকে এসব কথা বলবে না। ছেলে এখন লায়েক হয়ে গেছে। যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে।"

প্রণতি বললেন, "আমার প্রথম থেকেই কু গাইছিল মনটা। মিষ্টি যখন আসবে শুনছিলাম, তখন থেকেই আমার কেমন যেন একটা লাগছিল। তবু তোমার দাদা যে এত দূর ভেবে ফেলেছিল, সেটা আমার স্বপ্নেও মাথায় আসেনি।"

জীবেন কিছু বললেন না।

প্রণতি বললেন, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

জীবেন বললেন, "কী?"

প্রণতি বললেন, "তুমি জানতে না পুরো ব্যাপারটা কী হতে চলেছে?"

জীবেন বললেন, "এ আবার কেমন প্রশ্ন?"

প্রণতি বললেন, "তোমাদের যদি ছেলেটাকে পছন্দ না হত, না ডাকলেই পারত, ঘরে ডেকে এনে এটা কি না করলেই হচ্ছিল না? এ তো ঘোর পাপ। এত বড়ো পাপ পুজোর দিনে করতে পারলে? ছি ছি ছি, শেষে আমিও এত বড়ো পাপের ভাগীদার হলাম!"

জীবেন গম্ভীর হয়ে বললেন, "পাপ কে বলেছে তোমায়? এর থেকে পুণ্য আর কিছুতে নেই। আর পুজোর দিনই এর জন্য সেরা দিন।"

প্রণতি জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাদা ছাড়া কিছু বোঝো তুমি কোনও দিন? কাল যদি তোমার দাদা তোমাকে বলেন নিজের বউ ছেলেকে কুপিয়ে দিতে, তোমার বোধহয় হাতটুকুও কাঁপবে না, তাই না?"

জীবেন ভ্রূ কুঁচকালেন, "তোমার কী হয়েছে? এসব কেমন কথা বলা শুরু করেছ?"

প্রণতি বললেন, “পিকলুটার ওরকম অবস্থা, তোমাদের এরকম অবস্থা, আমি কোথায় যাই বলো তো? সারাবছর ধরে হাপিত্যেশ করে অপেক্ষা করে থাকি কখন ছেলেটা আসবে, নাতিটাকে দেখব, কিন্তু শেষে কী হল? ছেলেটা ওভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাতিটাকে দেখতে পর্যন্ত পারলাম না ভালো করে বাড়ির কাজের চাপে। বউমাও কেমন হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে সংসারটা কেমন হয়ে গেল।”

প্রণতি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন।

জীবেন বিরক্ত গলায় বললেন, “মাঝরাতে যাত্রাপালা শুরু কোরো না তো, কাল অনেক কাজ আছে। আমি আর এত উত্তেজনা নিতে পারছি না, আমাকে ঘুমাতে দাও।”

প্রণতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “ঘুমিয়ে পড়ো। আমিই জেগে থাকি সারারাত। আমার আর আজকে ঘুম হবে না। হ্যাঁ গো, তোমার জেল হবে না তো?”

জীবেন বললেন, “হলে হবে। আমি এসবে এত ভয় পাই না।”

প্রণতি বললেন, “সে তো কোনও কিছুতেই ভয় পাও না তুমি, কিন্তু যে বাড়ির সম্মানের কথা বলে সারাক্ষণ সবার কান মাথা খেয়ে নাও তোমরা, সেই তোমাদেরই যদি জেল হয়ে যায়, তাহলে সেই সম্মানের কী হবে সে সম্পর্কে কি কখনও ভেবেছ?”

জীবেন বললেন, “সম্মান বাড়বে।”

প্রণতি বললেন, “বাড়বে?”

জীবেন বললেন, “অবশ্যই বাড়বে, ওই ছেলেকে মারার দায়ে ফাঁসি হলেও পুণ্য হবে। স্বর্গে যাব।”

প্রণতি বললেন, “শোনো, আমি অত শিক্ষিত নই, কিন্তু আমি এটুকু বুঝি মানুষে মানুষে কোনও তফাত নেই। কাউকে মেরে কোনও দিন কোনও পুণ্যিলাভ করা যায় না।

সবসময় তুমি, তোমার দাদা আমাকে পায়ের তলায় রেখে দিয়েছ, আমাকে কোনও কিছু নিয়েই কিছু বলতে দাওনি। তোমরা যা যা বলেছ, আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি, কিন্তু এইবারে অনেক হল। যদি এরকম দিন আসে, যদি কখনও মনে হয় আমার ছেলের দিকে কেউ চোখ তুলেও তাকাবে, তখন কিন্তু আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না। এই কথাটা তুমি আর তোমার দাদা মনে রেখে দিয়ো। ছোটো থেকে ছেলেটা জেঠুর বকা খেয়ে খেয়ে মানুষ। অত বড়ো চাকরি পেল বাইরে যাবার, যেতে দিল না। কই নিজের মেয়ে জামাইকে তো বাধা দিল না? এইসব আমার চোখে পড়ে না ভেবেছ? কিন্তু আমি মুখ বুজে থাকি। এবার আর না। পিকলুর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। তাহলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না।"

জীবেন থমথমে মুখে বসে রইলেন।

২৯

সত্যেন ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলেন। পিকলু তাঁর রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।খাটে এসে জোরে জোরে শ্বাস নিলেন এবং ছাড়লেন। অতিরিক্ত টেনশনে এভাবেই নিজেকে সামলান তিনি। খাটে শুয়ে বালিশে হেলান দিলেন।মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ।প্রতিদিন ঘুমানোর আগে ফোন অফ করে ঘুমান তিনি। কী মনে হতে নির্মলকে ফোন করলেন। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরল না। নিজের মনে বললেন, "ঘুমিয়ে পড়েছে নির্ঘাত।"বহুদিন সব নেশা ছেড়েছেন। অনেকদিন পরে একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছিল।বেশ খানিকটা গরম লাগছে। সত্যেন এসি চালালেন। জানলা খোলা ছিল।

বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ একটা হার্টবিট মিস হল।তাঁর মনে হল জানলার ওপাশে শম্ভু এবং মিঠুন দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে।সত্যেন জানলা বন্ধ করলেন। বুঝতে পারলেন সবটাই তাঁর দুর্বল মনের কল্পনা। বজ্রাসনে বসলেন। মনটাকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করলেন। খুব ভালো করে জানেন সত্যেন সান্যাল, দুর্বল মন কঠিন কোনও কাজের ক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। খাটের পাশের টেবিলের ওপর একটা কাগজ রাখা। সত্যেনের এতক্ষণ চোখে পড়েনি। তিনি কাগজটা নিয়ে দেখলেন তার ওপর গোটা গোটা হাতের লেখায় একটা কবিতা লেখা,

দীন দানরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদিল রাজভৃত্য, “মহারাজ, বহু অনুনয়েসাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়েনা লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলেকরিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলেঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্বেলিত আনন্দধারায়ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলিসহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলিছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম উপবনেউন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণেসোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটিযেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটিবিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার ‘পরেএকা দেব রিক্ত দেবালয়ে।“

শুনি রাজা ক্ষোভভরেসিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়েসাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,‘হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতনঅভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জনদেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে? ‘

‘সে মন্দিরে দেব নাই’ কহে সাধু ।

রাজা কহে রোষে,‘দেব নাই! হে সন্ন্যাসী , নাস্তিকের মতো কথা কহ।রত্নসিংহাসন ‘পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—শূন্য তাহা?’

‘শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ’”

কবিতাটা এতখানি লেখা। রাজদম্ভে পূর্ণ লেখাটার নিচে আন্ডারলাইন করা। সত্যেন বিড়বিড় করে বললেন, “কত সাহস হয়েছে এদের! এত বাড় বেড়েছে? দেখছি সবকটাকে কাল। দেখে নিচ্ছি।”কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেঝেতে ফেলে দিলেন। গ্লাসে জল রাখা ছিল টেবিলে। গোটা গ্লাসের জলটা এক ঢোকে খেয়ে নিলেন।কী মনে হতে ফোনটা বের করে আবার নির্মলবাবুকে ফোন করলেন। কেউ ফোন ধরল না। সত্যেন বিরক্ত হয়ে থানার ল্যান্ডলাইনে ফোন করলেন। কেউ একজন ফোন ধরল, সত্যেন বললেন, “বড়োবাবুকে দিন তো। জরুরি দরকার আছে।”ওপাশ থেকে উত্তর এল, “উনি বাড়িতে গেছেন। সকালে আসবেন আবার। কে বলছেন আপনি?”“সত্যেন সান্যাল।”“ওহ, স্যার আমি ধীরেন বলছি, এই থানার মেজোবাবু,

কোনও সমস্যা হয়েছে?""না, না, ঠিক আছে।""স্যার কাল আসছি আমরা সবাই মিলে আপনার বাড়িতে।""হ্যাঁ অবশ্যই। তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। কাল জেলা সভাপতিও আসবেন, জানেন তো?""হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, রাখছি।"ফোনটা কেটে সত্যেন চোখ বোজার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই ঘুম আসছে না। ওষুধের বাক্সের মধ্যে একটা ঘুমের ওষুধের পাতা ছিল। সত্যেন বাক্স বের করে দেখলেন ওষুধের পাতাটা খালি।এসি ঘরের তাপমাত্রা দ্রুত কমিয়ে দিচ্ছে, তবু সত্যেন বুঝতে পারছেন কপাল, পিঠ সব ঘেমে যাচ্ছে।ঘড়িতে একটা বাজে। ভোরে উঠতে হবে তাঁকে। ফোনটা বন্ধ না করে খাটের ওপর রেখে শুতে যাবেন এমন সময় দেখলেন আবার ফোন আসছে।দেখলেন থানা থেকে ফোন। ধরলেন, "বলুন।""সর্বনাশ হয়েছে স্যার।"ওপাশ থেকে মেজোবাবুর উত্তেজিত গলা।সত্যেন ফোনটা ধরে বসে রইলেন।

৩০

ভোর পাঁচটা। এমনিতেই রাতে ঘুম হয়নি। ঘড়িতে পাঁচটা দেখে জীবেন উঠে সত্যেনের ঘরের সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বৈঠকখানায় বসলেন।

সত্যেন প্রতিদিন পাঁচটাতে বেরিয়ে যান। জীবেন দশ মিনিট অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন সত্যেন বেরোননি, তখন সত্যেনের ঘরের দরজায় নক করলেন।

সত্যেনের দরজা খুলতে যত দেরি হচ্ছিল, জীবেনের হার্টবিট তত বেড়ে যাচ্ছিল।

পাঁচটা পনেরো নাগাদ সত্যেন দরজা খুললেন। জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি রে, কী হল?"জীবেন সত্যেনের দিকে তাকালেন। সত্যেনের চোখ লাল হয়ে আছে। একটু থমকে বললেন, "তুই হাঁটতে যাবি না?"সত্যেন বললেন, "কাল সেই দুটোর সময়

ঘুমোতে পেরেছি কোনও মতে, আজ আর বেরোব না। তুই ভিতরে আয়।”জীবেন সত্যেনের ঘরের ভিতর ঢুকে অবাক হলেন। এতটা অবিন্যস্ত সত্যেনের ঘর কখনোই থাকে না। সত্যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করেন। তার পরিবর্তে মেঝেতে কাগজ ছিঁড়ে পড়ে আছে। জীবেন বললেন, “এগুলো কীসের কাগজ? ছিঁড়ে মেঝেতে ফেলেছিস কেন?”সত্যেন বললেন, “কোনও এক হারামজাদা আমার সঙ্গে কবিতা কবিতা খেলছে। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা কাগজে লিখে রেখে গেছে টেবিলে।”জীবেন অবাক হয়ে বললেন, “এই ঘরে রেখে গেছে? এত স্পর্ধা?”সত্যেন মাথা নাড়লেন, “তাই তো দেখছি, অনেকগুলো পাখা গজিয়েছে। সময়মতো সেগুলো ছাঁটতে না পারলে সান্যাল বংশের ঘোর অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা। আর সেটা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না।”জীবেন বললেন, “কাল তোর ঘুমোতে অত রাত হল কেন? পিকলুর জন্য?”সত্যেন বললেন, “না, পিকলু দুদিনের ছোঁড়া, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, ওকে নিয়ে আমি রাতের ঘুম নষ্ট করব এত খারাপ সময় এসেছে নাকি আমার?”জীবেন বললেন, “তবে?”সত্যেন বললেন, “নির্মলবাবুর বাড়িতে শম্ভুর বউয়ের লাশ পাওয়া গেছে। নির্মলকে সম্ভবত মারতে গেছিল। নির্মলের মাথায় বেশ জোরে কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। ব্লিডিং হয়েছে। হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।” জীবেন চমকে গিয়ে বললেন, “সে কী! বাঁচবে তো?”সত্যেন বললেন, “বাঁচা মরাটা তো বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে নির্মলের পরিবর্তে থানায় নতুন কে আসছে সেটা বুঝতে হবে। এই সময় নির্মলকে দরকার ছিল আমাদের। একেবারে পোষা কুকুর হয়ে গেছিল। যা করতে বলতাম তাই করত।”জীবেন একটু ইতস্তত করে বললেন, “দাদা একটা কথা আছে।”

সত্যেন বললেন, “বল।”

জীবেন বললেন, “কাল আমাকে পিকলু জানাল ও মিঠুনের মার্ডারের ব্যাপারটা পুলিশের ওপরমহলে জানিয়েছে। সম্ভবত নতুন করে ইনভেস্টিগেশন হতে পারে।”

জীবেন কথাটা বলে মাথা নিচু করলেন।

সত্যেন বললেন, “কীরকম ওপরমহল?”

জীবেন মাথা নাড়লেন, “সেটা তো আমাকে কিছু বলেনি।”

সত্যেন বললেন, “আজ কতজন লোকের খাবার কথা বাড়িতে?”

জীবেন বললেন, “অন্তত এগারোশো। বেশিও হতে পারে। খিচুড়ি ভোগের কাজ পুকুরের পাশের মাঠে শুরুও হয়ে গেছে কাল থেকেই।”

সত্যেন বললেন, “এবারে কতজন গরিবকে জামা আর শাড়ি দেওয়া হচ্ছে?”

জীবেন বললেন, “দুশোর ওপরে।”

সত্যেন বললেন, “এগুলো পুণ্য নয়? মানুষের ভালো করা নয়? গ্রামের রতন তাঁতির ছেলের টিউমার অপারেশনে গত বছর আমি একা এক লাখেরও বেশি টাকা দিয়েছিলাম। এগুলো পুণ্য নয়? মানুষের জন্য করা নয়?”

জীবেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সত্যেন বললেন, “নিজেদের হাতে মানুষ করা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলো যখন কথা শিখে বড়ো বড়ো কথা বলে তখন কেমন লাগে? মনে হয় না, আমাদের এত কিছু যাদের জন্য করা সেটাই আসলে ব্যর্থ হল?”জীবেন বললেন, “তুই... তুই চিন্তা করিস না, আমরা সব আছি তো। কেউ কিছু করতে পারবে না এই কেসে।”সত্যেন বললেন, “একটা ইয়ে ছেলে, উলটোপালটা বুঝিয়ে আমাদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবে আর আমি হাতে চুড়ি পরে বসে থাকব, কিচ্ছু করব না? এটা সম্ভব?”

জীবেন বুঝলেন সত্যেন ভীষণ রেগে যাচ্ছেন, তিনি বললেন, "নিজেকে সামলা, আমি দেখছি, পিকলুর সঙ্গে কথা বলি, ও উঠুক।"

সত্যেন গুম হয়ে বসে থাকলেন। জীবেন সত্যেনের ঘর থেকে বেরলেন।

৩১

সকাল সাড়ে সাতটা। অঞ্জলি শুরু হয়ে যাবে একটু পরেই। প্রণতি, রিংকুরা ঠাকুর দালানে জড়ো হয়েছে। গ্রামের অনেক মহিলাই এসে বসেছেন। সত্যেন আজ বেশি সক্রিয় নন। গম্ভীর মুখে বসে আছেন একটা চেয়ার নিয়ে। দীপককে দূরে বসে থাকতে দেখেও অন্যান্যবারের মতো পাশে ডেকে আনেননি। জীবেন পুজোর দিকটা দেখছেন।

রিংকু তনয়াকে জিজ্ঞেস করল, "পিকলু অঞ্জলি দেবে না?"

তনয়া বলল, "বলতে পারব না, এখনও তো ঘুমোচ্ছে।"

রিংকু বলল, "যা ইচ্ছে করুক।"

তনয়া বলল, "তুমি আমাদের ব্যাপারটা কাউকে বলেছ দিদি?"

রিংকু যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন মুখ করে বলল, "কোন ব্যাপারটা?"

তনয়া বলল, "যেটা কাল বললাম।"

রিংকু বলল, "না না, আমার তো মনেও নেই ঠিক করে। কেন বল তো?"

তনয়া বলল, "এমনি। মনে হল তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

রিংকু বলল, "আমার একদম এসব লোকের কান ভাঙানো স্বভাব নেই। তুই জানিস না, আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সব মেয়েদের সব গোপন কথা আমি জানি। কিন্তু কাউকে বলি না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।"

তনয়া হাসল, "আচ্ছা দিদি। না সেরকম কিছু না।"

রিংকু বলল, "তবে পিকলু আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। সেটা আশা করি তুইও বুঝতে পারছিস। কাল তো শুনলাম বাবার সঙ্গেও ওর কথা কাটাকাটি হয়েছে।"

তনয়া বলল, "এ বাবা, তাই নাকি? ওহ, আমার সঙ্গে তো ওর কোনও কথাও হয়নি কাল, এত কিছু করে এসেছে নাকি?"

রিংকু একটু উৎসাহিত হল "তা নয় তো কী, আচ্ছা ওর কি অফিসে কোনও প্রবলেম চলছে?"

তনয়া বলল, "জানি না তো এই ব্যাপারে কিছু। তুমি কিছু জানো?"

রিংকু বলল, "খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, সব জানিয়ে দেব তোকে। তুই শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগটা রাখবি। খবরদার পিকলু যেন এ ব্যাপারে না জানে। আর বাই দ্য ওয়ে, একটা জিনিস জানিস তো..."

তনয়া বলল, "কী?"

রিংকু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় একটা গাড়ি এসে সান্যালবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চারজন খাকি উর্দিধারী পুলিশ সোজাসুজি সদর দিয়ে ঠাকুরদালানে প্রবেশ করলেন। জীবেন এগিয়ে গেলেন, "কাউকে খুঁজছেন?"

রিংকু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

তনয়া বলল, "বুঝতে পারছি না তো। থানা থেকে কেউ এসেছে হয়তো।"

রিংকু হাসল, “ওসব থানা-ফানা বাবার পকেটে থাকে।”

চারজন সত্যেনের কাছে এসে কিছু কথা বললেন। সত্যেন উঠলেন। চারজনকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

জীবেন ঘামছিলেন। রিংকু উঠে জীবেনের কাছে গিয়ে বলল, “কী ব্যাপার কাকামণি? কী হয়েছে?”

জীবেন হাসার চেষ্টা করলেন, “ওই কয়েকজন পুলিশ এসেছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই, তোরা অঞ্জলির জন্য তৈরি হ।”

রিংকু ফিসফিস করে বলল, “হ্যাঁ, আমিও এতক্ষণ তনয়াকে তাই বলছিলাম জানো তো, এইসব পুলিশ-টুলিশ বাবার পকেটের ভিতর থাকে।”

জীবেন গলা নামিয়ে বললেন, “আস্তে কথা বল। পিকলুকে দেখেছিস?”

রিংকু বলল, “ঘুমোচ্ছে বলল তো তনয়া!”

জীবেন বললেন, “ঠিক আছে, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি, চিন্তা করিস না।”

রিংকু তনয়ার পাশে গিয়ে বসল। জীবেন বাড়ির ভিতর গিয়ে পিকলুর ঘরে প্রবেশ করলেন।

মশারির ভিতর পিকলু আর পিকলুর ছেলে ঘুমাচ্ছিল।

জীবেন পিকলুকে ঠেললেন, “শুনছিস?”

পিকলু উঠে বসল। বলল, “ওহ বাবা, কত দিন পরে তোমার মুখ দেখে উঠলাম বলো তো! দিনটা ভালো যাবে আজ। কটা বাজে?”জীবেন বললেন, “আটটা বাজতে চলল।”পিকলু অবাক হয়ে বলল, “আটটা বেজে গেছে! সে কী! এতক্ষণ তো সুদর্শনবাবুদের চলে আসার কথা ছিল! আসেননি?”জীবেন বললেন, “সুদর্শনবাবু মানে?

স্টেট লেভেল পুলিশের কেউ?"পিকলু হাই তুলতে তুলতে বলল, "ঠিক ধরেছ। এসেছেন?"

জীবেন ঘামছিলেন, "এর পিছনে তোর হাত আছে, তাই না?"

পিকলু বলল, "আমার? কী যে বলো না, আমি একজন সাধাসিদে লোক। আমার আবার হাত কীসের?"

জীবেন রুমাল বের করে ঘাড় মাথার ঘাম মুছলেন।

পিকলু বলল, "চলো। জেঠুকে একা ছাড়া ঠিক না। আমি আর তুমিও জেঠুর ঘরে ঢুকি।"

জীবেন কড়া চোখে পিকলুর দিকে তাকালেন, "কাজটা তুই ভালো করলি না পিকলু। আজ অষ্টমীর মতো একটা দিনে বাড়িতে পুলিশ এল..."

পিকলু হাসতে হাসতে বলল, "শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ।"

জীবেন বুঝলেন না, হাঁ করে পিকলুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

৩২

"সত্যেনবাবু।"

"বলুন। ব্রেকফাস্ট দিতে বলব?"

"না না, আমাদের নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা একটা রুটিন প্রশ্নোত্তর করে চলে যাব।"

"বেশ বেশ। আপনারা বোধহয় জানেন, এই এলাকার নির্বাচিত মন্ত্রী আমার বেশ কাছের একজন..."

"না সত্যেনবাবু জানি না। আমাদের এত কিছু না জানলেও চলে। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে চাই।"

"বলুন। দাঁড়ান এসি-টা চালিয়ে নি।"

"শ্যাল উই স্টার্ট?"

"হুঁ। শুরু করুন।"

"পরশু দিন আপনার ফ্যামিলিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে।"

"হ্যাঁ। কী বলব আর। আমার নিজের ভাগনিজামাইকে গ্রামের কয়েকজন..."

"কয়েকজন বলে তো জানি না, দেখলাম মাত্র একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। সেও শুনলাম অ্যারেস্ট করার সময় নাকি গণপিটুনিতে মারা গেছে।"

"বুঝতেই পারছেন, আমার ভাগনিজামাই, গণরোষ। বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করেও বিফল হতে হল।"

"সত্যেনবাবু।"

"বলুন।"

"আপনাকে একটা খবর দি।"

"বলুন।"

"নির্মলবাবু কিছুক্ষণ আগে এক্সপায়ার করেছেন।"

"ভেরি স্যাড।"

"কেন এরকম একটা ঘটনা ঘটল, সে সম্পর্কে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন?"

"না, আমি কাল রাতেও ওঁকে ফোন করেছিলাম। তখন ধরেননি। পরে থানার ল্যান্ডলাইনে ফোন করে জানতে পারি ঘটনাটা।"

"ওহ। ফোন করেছিলেন ওঁকে? কত রাতে?"

"একটা।""রাত একটা? সে কী! অত রাতে? খুব দরকার ছিল?""না মানে সেরকম কিছু না। ঘুমোতে যাবার আগে মনে পড়েছিল বড়োবাবুকে বলা হয়নি আজকের জন্য। উনি তো প্রায় সারারাতই জেগে থাকেন, তাই ফোন করেছিলাম আর কি।"

"আচ্ছা। সান্যালবাবু।"

"বলুন।"

"আপনার ফ্যামিলির মনে হয় পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"দাঙ্গায় আপনাদের ফ্যামিলির কারও কিছু..."

"নিজের মাকে..."

"ওহ, এখন যিনি আছেন?"

"সৎমা।"

"ওহ, এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট।"

"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"এমনি, বেসিক কৌতূহল আর কি!"

"আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

“বলুন।”

“আপনাদের এখানে কে আসতে বলেছে?”

“সেটার উত্তর আমরা দিতে পারব না সান্যালবাবু। আপনি বরং চেষ্টা করুন আমাদের প্রশ্নগুলোর যথাসম্ভব ঠিক উত্তর দিতে।”

“আমি তো আশা করি সব উত্তরই দিয়েছি।”

“চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।”

“নিশ্চয়ই। উপরের ঘরে আছে ও। তবে ওর সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভালো। ওর মেন্টাল স্টেট খুব খারাপ।”

চারজন উঠে দাঁড়ালেন। “ওকে মিস্টার সান্যাল। আপনি যখন বারণ করছেন তবে পরেই কথা বলা যাবে। থ্যাংকু ফর কো-অপারেটিং আস। আমরা এখন বেরোচ্ছি। পরে আবার দরকার হলে আসব।”

সত্যেনের দরজা ভেজানো ছিল। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে দরজাটায় নকের শব্দ পাওয়া গেল। চারজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

একজন বললেন, “আপনি বসুন সত্যেনবাবু। আমি দেখছি।”

দরজাটা খোলা হল। দরজার ওপাশে চন্দ্রিমাকে নিয়ে প্রণতি দাঁড়িয়ে আছেন।

সত্যেন ঘরের ভিতর থেকেই রাগি গলায় বললেন, “তোমরা এখানে কেন?”

চন্দ্রিমা দৃঢ় পায়ে ঘরের ভিতর এসে বসল। বলল, “আপনারা কি লোকাল থানা থেকে আসছেন?”

“আজ্ঞে না। আমরা একটু দূর থেকে আসছি।”

সত্যেন প্রণতিকে বললেন, “ওকে নিয়ে যাও না। ও তো অসুস্থ।”

প্রণতি ঘরের মধ্যে ঢুকে গম্ভীর মুখে বসলেন। বললেন, "একটুও অসুস্থ নেই। জ্বর নেই, বমি ভাবটা নেই। মিষ্টি এক্কেবারে সেরে গেছে।"

একজন ইন্সপেক্টর বললেন, "ওঁকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।"

চন্দ্রিমা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ওঁর বোনের মেয়ে। আমার হাজব্যান্ডকেই উনি লোক দিয়ে খুন করিয়েছিলেন।"

৩৩

ঠাকুরদালান ভর্তি গ্রামের লোক। সবার সামনে দিয়ে সত্যেন পুলিশের গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

পুজোর ঢাক শুধু অনবরত বেজে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে অঞ্জলি শুরু হবে।

গাড়িটা বেরিয়ে যেতে সংবিৎ ফিরল রিংকুর। জীবেন একপাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রিংকু দৌড়ে গিয়ে বলল, "কী হল কাকামণি, বাবাকে নিয়ে কোথায় গেল ওরা?"

জীবেন রিংকুকে বললেন, "কিছু প্রশ্ন করার আছে, সেজন্যই নিয়ে গেল। দেখ, বিকেলের মধ্যেই দিয়ে যাবে হয়তো।"

রিংকু অবুঝের মতো বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো বাড়িতেই করা যেত? সভাপতিকে ফোন করো না, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। বাবাকে পুজোর দিন বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গেল! এত বড়ো সাহস ওরা পায় কী করে!?"

জীবেন বাকিদের দিকে তাকালেন। সবাই তাঁদের দেখছে। বললেন, “তোরা অঞ্জলিটা দে। দাদা বলে গেছে যেন কোনও কিছু না আটকায়।”

জীবেন বৈঠকখানার দিকে রওনা হলেন, রিংকু জীবেনের পিছন পিছন এল, “ওরা কি বাবাকে অ্যারেস্ট করেছে?”

জীবেন রিংকুকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন, “না না, সেসব কিছু না।”

বৈঠকখানায় কল্যাণ, সোমা চন্দ্রিমাকে নিয়ে বসে আছেন। পিকলুও আছে।

ঘরে ঢুকেই রিংকুর তাদের দেখে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, বলল, “এক বাড়িতে থেকে নিজের থেকে পরের জন্য দরদ বেশি, তাই না? এইজন্য বলে সৎ বোন কখনও আপন হয় না।”

সোমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসেছিলেন। রিংকুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। পিকলু জীবেনকে বলল, “দিদিকে বাইরে নিয়ে যাও। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”

জীবেন সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। চন্দ্রিমা বলল, “রিংকুদি, আপন হয় না বলেই আমার বরটাকে মেরে দিল মামা, বলো?”

জোঁকের মুখে যেন কেউ নুন দিল। রিংকু চন্দ্রিমার দিকে তাকাতে পারল না। একপ্রকার পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

পিকলু বলল, “ক্যাপ্টেনের উইকেট পড়ে গেছে বাবা। তুমি তো আবার নাইট ওয়াচম্যান। বলা যায় না, উইকেটে থাকবে, না যখনতখন আউট হয়ে যাবে।”

জীবেন পিকলুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “তুই অঞ্জলি দিবি না?”

পিকলু বলল, “দেব, অবশ্যই দেব। রাজদম্ভ দূর হয়েছে। দেবীপক্ষ শুরু হল আজ থেকে। আজ দেব না তো আর কবে দেব?”

জীবেন পিকলুর দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বললেন, "মা অবশ্যই আছেন, তিনিই দাদাকে রক্ষা করবেন।"

পিকলু জীবেনের চোখে চোখ রেখে বলল, "যারা ধর্মের নামে মানুষে মানুষে হানাহানি বোঝে, যারা ধর্ম বলতে শুধুই হিংসা বোঝে, তাদের জন্য মা কোনও দিনও ছিলেন না বাবা। থাকবেনও না। অসুর কোনও কালেই দেবতা হতে পারেনি। পারবেও না। তোমরা ভেবে এসেছ ক্ষমতা আছে মানে যা ইচ্ছা তাই করবে, আইনকানুন সব পকেটে রেখে দেবে! সব এত সহজ? এত? তোমরা হয়তো জানো না, পুলিশে শুধু নির্মল চৌধুরীরা নেই। আরও অনেকে আছে। এবারে জানবে।"

জীবেন মাথা নিচু করলেন। ছেলের চোখে চোখ রেখে তাকানোর ক্ষমতা আর নেই তাঁর।

পিকলু বলল, "চিরকাল ভেবে এসেছ সব বড়ো বড়ো লোকেদের সঙ্গে তোমাদেরই আনাগোনা, তাই না? একটা ছোট্ট ইনফো দিয়ে দি। পিসেমশাইয়ের বন্ধুই সুদর্শনবাবু। মাংসটা এতক্ষণ নুন ছাড়া রান্না হচ্ছিল বলো? এবার একটু মশলা পড়ল। ভেবো না বাবা, তুমিও রেহাই পাবে না।"

জীবেন কল্যাণের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। কল্যাণ চুপ করে রইলেন।

প্রতিবারের মতোই।

#

রিংকু ঠাকুরদালানে এসে দেখল গ্রামের মেয়ে বউরা সবাই গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দীপক চুপচাপ এক কোণে বসে আছে। তার সব রাগ পড়ল গিয়ে দীপকের ওপর। থমথমে মুখে দীপককে বলল, "এদিকে এসো।"

দীপক রিংকুর কথা যেন শোনেনি এমন মুখ করে বসে রইল।

রিংকুর ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ চেপে থাকা রাগটার বিস্ফোরণ ঘটল, সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই তোমাকে ডাকছি না আমি? শুনতে পাচ্ছ না?"

সবাই রিংকুর দিকে তাকাল।

দীপক উঠল। রিংকুর সামনে এসে দাঁড়াল, রিংকু বলল, "কী হল? না চ্যাঁচালে শুনতে পাও না, না?"

দীপক বলল, "আমি বাড়ি যাব আজ। এখন বেরোব। তুমি কী করবে ঠিক করে নাও।"

রিংকু বলল, "বাড়ি যাবে মানেটা কী? এত বড়ো ঘটনা ঘটে গেল বাড়িতে আর তুমি বাড়ি যাবে?"

দীপক চোয়াল শক্ত করল, "হ্যাঁ। একজন খুনির বাড়িতে থাকার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।"

রিংকু দীপকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সে ভাবতেই পারেনি দীপক এই কথাটা বলতে পারে।

দীপক বলল, "আর-একটা কথা, ভবিষ্যতে এই বাড়ির সঙ্গে যদি তোমার কোনও সম্পর্ক থাকে, তাহলে এই বাড়ির সঙ্গেই রেখো, আমার কাছে আসার কথা ভেবো না। এখন নটা কুড়ি বাজে, দশটার মধ্যে আমি বেরোব। তুমি ঠিক করে নাও, তুমি কী করবে, থাকবে, না যাবে।"

রিংকু ঠাকুরদালানের মেঝেতে বসে পড়ল। দীপক হনহন করে নিজেদের ঘরে রওনা দিল।

৩৪

সান্যালবাড়ির বাইরে দেবু গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এতক্ষণ ছিল না। এসে খবরটা শুনে মুষড়ে পড়েছে।

জীবেনের বাড়ির ভিতর ভালো লাগছিল না। বাইরে বেরিয়েছিলেন। দেবুকে দেখে ডাকলেন, "তুই কোথায় ছিলি?"

দেবু বলল, "বাবু তো আমাকে থানায় পাঠিয়েছিলেন।"

জীবেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর পাঠিয়ে কী হবে? খেলা তো শেষ।"

দেবু বললেন, "কেন শেষ হবে বাবু? কোর্টে কত খেলা বাকি জানেন? আসল খেলাই তো কোর্টে। প্রমাণই করতে পারবে না কেউ।"

বাড়ির ভিতরে নিতান্ত নিয়মরক্ষার মতো অঞ্জলি হচ্ছে। দেবুর কথাটা জীবেন শুনলেও আমল দিলেন না। বললেন, "অনেক লোক আসবে। থাকিস। আমি আজকে হয়তো বেশি তদারকি করতে পারব না।"

দেবু কিছু বলল না। জীবেন বাড়ির ভিতরে এলেন। দীপক ব্যাগ নিয়ে বসে আছে গম্ভীর মুখে। কিছুক্ষণ পরেই ওরা বেরিয়ে যাবে। পিকলুকে ঠাকুরদালানে দেখতে না পেয়ে পিকলুর ঘরে গেলেন। পিকলু মন দিয়ে পুরোনো খবরের কাগজ পড়ছে। তাঁকে দেখে বলল, "আবার কোনও হুমকি দিতে এলে বাবা?"

জীবেন কথা বললেন না, চুপ করে খাটে এসে বসলেন।

পিকলু কাগজে মুখ রেখে নির্লিপ্ত গলায় বলল, "আমাকে কিছু বলে লাভ নেই বোধহয়। পিসেমশাইও যথেষ্ট শক্ত মানুষ। পোষা গুন্ডাগুলোকে লেলিয়ে দিয়ে বড়োজোর খুন করাতে পারো। কিন্তু তাতে জেঠু আরও বেশি ফাঁসবে মনে রেখো।"

জীবেন বললেন, "আমি কি তোর কাছে একটু বসতেও পারি না?"

পিকলু অবাক হয়ে জীবেনের দিকে তাকাল। বলল, "তোমার শরীর-টরীর ঠিক আছে তো? নাকি জেঠু নেই বলে মস্তিষ্কহীন হয়ে পড়েছ?"

জীবেন রাগ করলেন না। বললেন, "ছোটোবেলা থেকে মা না থাকার যন্ত্রণা সবাই বোঝে না পিকলু। একটা সময় ছিল যখন দাদা নিজের হাতে আমাকে খাইয়েও দিয়েছে। তুই আমাকে এসব বলে রাগাতে পারবি না।"

পিকলু বলল, "তোমাকে রাগানোর কোনও ইচ্ছা আমার কোনও কালেই ছিল না বাবা। তবে মেরুদণ্ডহীন একটা লোককে বাবা বলে ডাকতে খুব কষ্ট হয় আজকাল। ধর্মের নামে যারা একটা তরতাজা যুবককে খুন পর্যন্ত করতে পারে, তারা সব কিছু পারে।"

জীবেন বললেন, "তোকে সব কিছু বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব না। তোরা চোখে ঠুলি পরে বসে আছিস।"

পিকলু বলল, "বেশ করেছি ঠুলি পরে বসে আছি। যাদের মেয়ে তার চিন্তা নেই, মামাদের ঘুম নেই! সত্যেন সান্যালের মেয়ে মিষ্টি? তার বাপের কী ছিল? যে মেয়ের বাপ মা মেনে নিয়েছে জামাইকে, তোমাদের কী সমস্যা ছিল, বলতে পারবে?!"

জীবেন পিকলুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "প্ল্যানটা মেরে ফেলার ছিল না প্রথমে।"

পিকলু অবাক হয়ে বলল, "তবে?"

জীবেন বললেন, "প্রথমে ঠিক ছিল মিষ্টি এখানে এলে ওকে বোঝানো হবে। মিঠুনের সেদিনই কলকাতা ফিরে যাবার কথা ছিল। মিষ্টিকে এখানেই আটকে রেখে ওকে আর

কলকাতা যেতে না দেওয়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু দাদা ওকে আর মিঠুনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিল। তারপরে আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি।”

পিকলু একটু গুছিয়ে বসে বলল, “ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে থাকলে সমস্যাগুলো ঠিক কোথায় বাবা? ধরো, আমি আর তনয়া এই ঘরে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আছি, তুমি ভুল করে দরজা খুলে দেখে ফেলেছ। তুমি কি আমাদের খুন করতে বলে দেবে? নাকি ছেলেটা মিঠুন ছিল বলেই তোমাদের যত সমস্যা?”

জীবেন বললেন, “আমার তোকে বোঝানোর ক্ষমতা নেই। তুই কাগজ পড়। আমি চুপচাপ বসে থাকি। বাড়ির যেখানে যাচ্ছি, লোকের প্রশ্নবাণ আমি আর নিতে পারছি না। আমাকে একটু বসে থাকতে দে দয়া করে।”

পিকলু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাগজে মন দিল। জীবেন চুপচাপ বসে থাকলেন।

দীপক এসে জীবেনকে দেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পিকলু বলল, “এসো এসো, বাবা এখন স্লিপ মোডে আছে, তোমার চিন্তা নেই।”

দীপক ঘরের ভিতর ঢুকে বলল, “আমরা বেরোব একটু পরে।”পিকলু অবাক হয়ে বলল, “সে কী! বাড়িতে পুজো হচ্ছে আর তুমি বাড়ির লক্ষ্মীকে নিয়ে চলে যাবে? ইয়ার্কি নাকি?”

দীপক জীবেনের দিকে একবার তাকিয়ে পিকলুর দিকে তাকাল, “রিংকু থাকলে এখানে সমস্যা বাড়বে পিকলু। ও বারবার মিষ্টিকে আঘাত করতে পারে, যেটা এই সময় অভিপ্রেত নয়।”

পিকলু দীপকের কথায় আমল না দিয়ে বলল, “গতবার আমি পাঁপড় খাইয়েছিলাম, এবার তোমার পালা ছিল। পালিয়ে গেলে হবে ভাই?”

জীবেন উঠছিলেন। পিকলু বলল, “বসো বাবা। অনেক কথা আছে। পুজোটা তো আমাদেরই সামলাতে হবে। মা এসেছেন বাড়িতে, তাঁর যেন কোনওরকম অনাদর না হয়। দ্য শো মাস্ট গো অন।”

জীবেন পিকলুর কথা শুনে ছেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

৩৫

দশটা নাগাদ গাড়িটা যশোর রোডে উঠল। একজন সত্যেনকে বললেন, “কিছু খাবেন?”

সত্যেন গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন, বললেন, “না, আমার খিদে নেই। আপনাদের নামগুলো আমাকে দেবেন। আমি ওপরমহলে কথা বলব।”

জিপের পিছনের সিটে সত্যেনের দুপাশে যে দুজন বসে ছিলেন তাঁরা হাসলেন, সত্যেনের ডানদিকের জন বললেন, “কী ব্যাপারে কথা বলবেন? আমাদের প্রোমোশনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই?”

সত্যেন চুপ করে গেলেন। ড্রাইভারের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, “আমার নাম সুদর্শন রায়, আপনার ডানদিকে যিনি বসে আছেন তিনি রাতুল মিত্র, বাঁদিকে মাসুদ হক, ড্রাইভারের নাম আর বললাম না। ওর প্রোমোশন না হলেও চলবে বোধহয়।”

সত্যেন বললেন, “আপনারা জানেন না, আপনারা কত বড়ো ভুল করছেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাড়িতে জেলা সভাপতি আসবেন।”

সুদর্শনবাবু ড্রাইভারকে বললেন, “গাড়িটা দাঁড় করাও।”

গাড়িটা রাস্তার পাশে সাইড করল ড্রাইভার। সুদর্শন বললেন, "বলুন সত্যেনবাবু, অনেকক্ষণ ধরে আপনি বলে যাচ্ছেন আমরা ভুল করেছি। বলুন, কী কী ভুল করেছি।"

সত্যেন রাগি গলায় বললেন, "যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, নিয়ে চলুন। ফালতু কথাবার্তা আমার একেবারে ভালো লাগছে না।"

সুদর্শন বললেন, "আপনার জন্য দুটো খবর আছে সত্যেনবাবু।"

সত্যেন বললেন, "কে খবর দিল? কোনও ফোন এল না তো?"

সুদর্শন হাসলেন, "খবরটা একটু দূরে এসেই বলব ভেবেছিলাম।"

সত্যেন বললেন, "বলুন। যা বলার বলুন।"

সুদর্শন বললেন, "এক নম্বর খবর, মিঠুনকে লোক দিয়ে খুন করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনি জানতেন না, যাকে আপনি খুন করাচ্ছেন, তার বীজ চন্দ্রিমার শরীরে বপন করা হয়ে গেছে। ইয়েস স্যার, শি ইজ প্রেগন্যান্ট। তাই আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মিঠুনকে শেষ পর্যন্ত মারতে পারলেন না। কপাল কত ভালো বলুন তো মেয়েটির, আপনাকে সুখবরটা আগে দেয়নি। দিলে হয়তো মেয়েটিকেও আর আপনি ইহজগতে বাঁচিয়ে রাখতেন না।"

সত্যেন কড়া চোখে সুদর্শনের দিকে তাকালেন, "আর দু নম্বর খবর?"

সুদর্শন বললেন, "আমরা আপনাকে কলকাতা অবধি নিয়ে যাচ্ছি না।"

সত্যেন বললেন, "মানে?"

সুদর্শন বললেন, "পোয়েটিক জাস্টিস মানে কাকে বলে জানেন?"

সত্যেন কড়া গলায় বললেন, "যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।"

সুদর্শন বললেন, "সত্যেন সান্যাল। ইনফ্লুয়েনশিয়াল পলিটিশিয়ান। মাকে হারিয়েছেন দাঙ্গায়। দাঙ্গার দগদগে ঘা মেটার নয়। এই অবস্থায় মানুষ দুরকম ভাবে রিঅ্যাক্ট করে। এক, মানুষ দাঙ্গার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে, এবং এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে সারাজীবন ধরে। দুই, মানুষটা সামান্য কিছু এদিক ওদিক দেখলেই নিজের রেফারেন্স টেনে আনে এবং তার মাথায় আর অন্য কোনও কিছুই চলে না। সে এতটাই ভায়োলেন্ট হয়ে যায় যে চরমতম অপরাধ করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না।"

সত্যেন বললেন, "কী বলতে চাইছেন আপনি?"

সুদর্শন বললেন, "ফ্যাক্ট নম্বর ওয়ান, মিষ্টি যেমন আপনার ভাগনি, তেমনি আমারও ভাইঝি। হ্যাঁ, রক্তের সম্পর্ক নেই হয়তো। কিন্তু সেটা ম্যাটার করে না। একজোড়া মানুষ ভালোবেসেছিল সেটাই ম্যাটার করেছিল সেদিন। ওদের বিয়েটা আমিই দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছিলাম মিস্টার সান্যাল। ফ্যাক্ট নাম্বার টু, মর্গে মিঠুনের পাশের ট্রে-টা খালি আছে।"

সত্যেন অবাক হয়ে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সুদর্শন বললেন, "কী আশ্চর্য বলুন, হিন্দু মুসলিম শিখ বৌদ্ধ খ্রিস্টান, মর্গে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। মৃতরা দাঙ্গাও করতে পারে না।"

সত্যেন দরদর করে ঘামছিলেন।

সুদর্শন বললেন, "ঘুমের ওষুধ দেব সত্যেনবাবু? এফেক্টিভ। চিন্তা করবেন না, আপনার মৃত্যু হবার আগে অবধি আমরা আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব না। কিংবা আপনার কোনও অল্টারনেটিভ ওয়ে জানা আছে?"

সত্যেন একটু গলা খাঁকরিয়ে বললেন, "আমার মার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারলে ভালো হত।"

সুদর্শন বললেন, "সৎমা তো। ভদ্রমহিলাকে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখে দিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছি আপনি খেতেও দেন না ভালো করে। আর আমাদের দয়া করে এসব সেন্টিমেন্ট দেবেন না। বুঝতেই পারছেন, আমাদের হৃদযন্ত্রে রস কষ তেমন নেই।"

সত্যেন বললেন, "পুজোর দিনে... আপনারা এটা করতে পারবেন?"

সুদর্শন হাসলেন, "পরশু ষষ্ঠী ছিল সত্যেনবাবু। আপনি করতে পেরেছিলেন যখন, আমরাও নাহয় কষ্টেসৃষ্টে করে নেব!"

সত্যেন মাথা নিচু করে জিপের মধ্যে বসে রইলেন।

সুদর্শন একটা সিগারেট ধরালেন।

দূর থেকে কোথাও একটা ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে।

সুদর্শন মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

পুজোর সময় ঢাকের আওয়াজ শুনলে মনে হয় স্বর্গ পৃথিবীতেই নেমে এসেছে...